গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ১৭ সংখ্যা | ১৫ - ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

গ্রাহক প্রতিরোধে স্মার্ট মিটার লাগাতে পারল না কোম্পানি

বিদ্যুৎ গ্রাহক স্বার্থবিরোধী স্মার্ট মিটার লাগানোর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ রাজ্যের তৃণমূল সরকার অতি উৎসাহে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা ইতিমধ্যে ৩৭ লক্ষ মিটার কেনার ব্যবস্থা করেছে। আসাম, ওড়িশা, জম্মু-কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, বিহার সহ বেশ কিছু রাজ্যে স্মার্ট মিটার বিরোধী গ্রাহক আন্দোলনের খবর এখন সকলেই জানেন।

সর্বত্রই অত্যধিক বিল, টাকা শেষ হলেই যখন তখন লাইন চলে যাওয়া, ব্যবহার না করেও বিশাল অঙ্কের খারাপ বা বন্ধ মিটারের বিলের সংশোধন না হওয়া এবং সর্বোপরি চাহিদা যখন যেমন বাড়বে দাম তেমন তেমন বাড়ার আক্রমণে গ্রাহকরা অতিষ্ঠ। স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে এই রাজ্যে ও জেলায় জেলায় প্রতিরোধ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)। এই মিটার লাগাতে গেলে জেলাগুলোতে ক্ষুদ্রশিল্পের গ্রাহকরা কোথাও ব্যক্তিগতভাবে, কোথাও গ্রাহক প্রতিরোধ কমিটি থেকে বাধা দেওয়ায় বন্টন কোম্পানির লোকজনকে মিটার না লাগিয়ে ফিরতে হচ্ছে।

গত অক্টোবরে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কেওটশা সিসিসি (কাস্টমার কেয়ার সেন্টার)-এর বাগজোলা বাজারে প্রথমে গ্রাহকদের আপত্তিতে মিটার লাগাতে না পেরে ফিরে যায় কোম্পানির লোকজন। স্টেশন ম্যানেজার এই কারণে পাঁচজন গ্রাহকের লাইন কাটার হুমকি

চারের পাতায় দেখুন

নির্বাচনে বিকল্প লাইন তুলে ধরার দায়িত্ব ছিল বামপন্থীদেরই, কিন্তু ...

মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড় সহ পাঁচটি রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ পেতেই সংবাদমাধ্যম জুড়ে শুরু হয়েছে নানা কাটাছেঁড়া। বিজেপির এই সাফল্যের কারণ কী, কংগ্রেসের এই ব্যর্থতা কী কারণে ঘটল— এই সবই সেই আলোচনার বিষয়। বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। তারা তো এ প্রশ্ন তুলবে না যে, এই নির্বাচন থেকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী জনগণ কী পেল বা তাদের জীবনের সমস্যাগুলির কোনও সুরাহা হল কি না? কোথাও কংগ্রেসকে সরিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এল, কোথাও অন্য কাউকে সরিয়ে কংগ্রেস ক্ষমতায় এল। কিন্তু তাতে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির কিএতটুকুও সুরাহা হবে? অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সংবাদমাধ্যমে কোথাও এই সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা নেই, তা থাকার কথাও নয়।

আজ আর কারও জানতে বাকি নেই যে এই নির্বাচনে জনগণের নতুন কিছুই পাওয়ার ছিল না। বাস্তবিক এ বারের নির্বাচনে শাসক এবং বিরোধী রাজনীতির ফারাকটা যে ভাবে মুছে গিয়ে উভয় রাজনীতির একাকার রূপটা ফুটে উঠল, তাতে ঝান্ডার রঙ ছাড়া দলগুলির পার্থক্য করাই দুষ্কর। উভয় পক্ষেরই ইস্যু তথা প্রতিশ্রুতিগুলি ছিল অবিকল এক। সব শাসক দলই দাবি করেছে, জনজীবনের বিরাট উন্নয়ন তারা ঘটিয়েছে। জনস্বার্থে তারা দারুণ কাজ করেছে। বাস্তবে কী উন্নয়ন

ছয়ের পাতায় দেখুন

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস পালন রাজ্য জুড়ে

৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কালো দিনে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সভা। হাতিবাগান, কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলিতে স্নাতক স্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থা কলেজগুলির হাতে তুলে দিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি ও বেসরকারিকরণ করার চক্রান্তের প্রতিবাদে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না করে ন্যায়পাল নিয়োগে ইউজিসি-র কালা সার্কুলারের বিরুদ্ধে এবং রাজ্যপাল ও সরকারের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের মামলার খরচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে তোলার প্রতিবাদে ১১ ডিসেম্বর এআইডিএসও কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কলকাতা (ছবি), প্রেসিডেন্সি এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল হয়।

বিধানসভায় কু-কথার লড়াই

ভোটকেন্দ্রিক রাজনীতিতে রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলের বাদানুবাদ বহু দিন ধরেই পরস্পরের প্রতি নোংরা কাদা-ছোঁড়াছুড়িতে পরিণত হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে, এই বিরোধিতা যেন কদর্যতার শেষ সীমাটুকুও ছাড়িয়ে যেতে বসেছে।

সম্প্রতি রাজনৈতিক বিরোধিতার নামে আবারও কু-কথার লড়াইয়ের সাক্ষী হতে হল রাজ্যবাসীকে। কলকাতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক সভার পরপরই বিজেপির নেতারা বিধানসভা চত্বরে এসে ধর্নায় বসে পড়েন। সেখানে আগে থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের ধর্না চলছিল। শুরু হয়ে যায় একে অপরের প্রতি গালিবর্ষণ, উগ্র বিদ্বেষবর্ষী কামান দাগা। পরিস্থিতি এমন চেহারা নেয় যে পুলিশকে দুই বিবদমান পক্ষের মাঝে ঢাল হয়ে দাঁড়াতে হয়। কয়েকদিন ধরেই দুই দলেরই নেতা-মন্ত্রীরা পরস্পরবিরোধিতার নামে এই নির্লজ্জ আচরণ চালিয়ে যান। ঘটি-বাটি-থালা বাজিয়ে হল্লা করা, এক দলের অবস্থানস্থলকে 'অপবিত্র' ঘোষণা করে অপর দলের সেই জায়গা গঙ্গাজলে 'শোধন' করা থেকে শুরু করে এর ওকে 'চোর' এবং ওর একে 'পকেটমার' আখ্যা দেওয়া— কিছুই বাদ দেননি 'গণতন্ত্রে'র তথাকথিত এই মুখপাত্ররা। এই আচরণের দ্বারা তাঁরা শুধু যে সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকেই নির্বিচারে দু'পায়ে মাড়িয়ে গেলেন তাই নয়, সভ্যতা, শালীনতা, ভদ্রতাবোধের যে সংস্কৃতি সমাজে আজও খানিকটা টিকে আছে, সে সবের তোয়াক্কাটুকুও করলেন না।

সভ্য মানুষ প্রশ্ন তুলছেন, গণতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠান 'নির্বাচন'কে ঘিরেই যাদের যাবতীয় কার্যক্রম, সেই নেতারা সুস্থ বিতর্কের পরিবর্তে এ ভাবে অর্থহীন ও নোংরা 'কলতলার কোন্দলে' সামিল হচ্ছেন কেন? আসলে এ ছাড়া তাঁদের ঝুলিতে কার্যত আর কিছুই নেই। লক্ষ করলে দেখা যাবে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে, কিংবা রাজ্যে, শাসক ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মৌলিক নীতি-আদর্শগত প্রশ্নে পার্থক্য নেই বললেই চলে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি-রাজনীতির এই দেশে নির্বাচনকেন্দ্রিক প্রতিটি রাজনৈতিক দলই পুঁজিপতি শ্রেণিস্বার্থের অনুগত সেবক। কেউ একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিগোষ্ঠীর, কেউ বা তারই সঙ্গে আঞ্চলিক পুঁজির স্বার্থের রক্ষক। আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি প্রণয়ন থেকে শুরু করে এই দলগুলির যাবতীয় সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমের লক্ষ্য পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফার সুরক্ষা ও বৃদ্ধি। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের জন্য মাঝে মাঝে কিছু দান-খয়রাতি আর শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি বর্ষণ ছাড়া এঁদের রাজনীতি আর কিছুই নেই। এ দিকে, ভোটে জিতে সরকারি ক্ষমতা পেতে পুঁজিপতি শ্রেণির আশীর্বাদের পাশাপাশি

দুয়ের পাতায় দেখুন

নজরুলের গানের এই বিকৃতি অপরাধ

সম্প্রতি ‘পিপ্পা’ সিনেমায় ব্যবহৃত বিপ্লবী কবি নজরুল রচিত ‘কারার ওই লৌহ কপাট’ গানের বিকৃতি প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় ১৯২৪-এর মে মাসে তারকেশ্বরের ঘটনা। সেদিন নজরুলের গানে উদ্বেলিত হয়ে মোহন্তদের নিযুক্ত লাঠিয়ালদের সর্দার লাঠি নামিয়ে রেখে শপথ নিয়েছিলেন দেশের মানুষের বিরুদ্ধে লাঠি না ধরার।

মনে পড়ে, কলকাতার অ্যালবার্ট হলে নজরুলের সংবর্ধনা সভায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, ‘আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব, সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে, আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব।’ বাস্তবে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নজরুলের গান, কবিতা উদ্দীপনা অনুপ্রেরণার মশাল হয়ে জ্বলে উঠেছে বারবার। যে ‘কারার ওই লৌহ কপাট’ গানটির বিকৃতিকে ঘিরে আজ প্রশ্ন উঠেছে, সেই ‘ভাঙার গান’-এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা বারুদের স্তূপকে চিনতে কিন্তু দেরি করেনি সে দিনের ব্রিটিশ সরকার। প্রকাশের সাথে সাথে এই গান তারা বাজেয়াপ্ত করেছে।

১৯২৯ সালের ২৩ আগস্ট ‘নবশক্তি’ পত্রিকার সম্পাদককে লেখা চিঠিতে নজরুল ইসলাম তাঁর নিজের গানের কথা ও সুরের বিকৃতি নিয়ে কিছু কথা বলেছিলেন। নজরুল লিখছেন, ‘... একদিন একজন রেডিও স্টার আমার ‘আমারে চোখ ইশারায়’ গানটার ল্যাজা-মুড়ো হাত-পা নিয়ে এমন তাল পাকিয়ে দিলেন যে তা দেখে মনে হল, বুঝি বা গানটার ওপরে একটা মোটরগাড়ি চলে গেছে। ...’ ‘পিপ্পা’ চলচ্চিত্রে ‘কারার ওই লৌহ কপাট’ গানটি নিয়ে যে ছেলেখেলা করা হয়েছে, তা ওই গানের ওপর দিয়ে মোটরগাড়ি চলে যাওয়ার সামিল।

চলচ্চিত্রে এই গান ব্যবহার হয়েছে আগেও। ১৯৪৯ সালে নির্মল চৌধুরি পরিচালিত ছবি ‘চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন’। সেখানে একটি দৃশ্যে নজরুলের এই গান গাইছেন ব্রিটিশ জেলে বন্দি বিপ্লবীরা। শুনলে আজও শিহরণ জাগে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে ব্রিটিশ পদানত ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের অদম্য তেজ, কারাগারের বন্ধনকে পরোয়া না করার বিপ্লবী স্পর্ধা। ১৯৭০-এ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকার এবং মুক্তিযোদ্ধা জহির রায়হান তাঁর ‘জীবন থেকে নেওয়া’ ছবিতে গানটি ব্যবহার করেছিলেন। জেলবন্দি মুক্তিযোদ্ধারা কারার ওই লৌহকপাট গাইছেন, প্রত্যয়ে জ্বলে উঠছে তাঁদের চোখ। সাম্প্রতিক কালের ‘উইংকল টুইংকল’ নাটকের শেষ দৃশ্যেও এই গানের চমৎকার প্রয়োগ দেখেছি আমরা। গানটি একাত্ম হয়ে আছে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সাহস, শাসকের বন্দিশালা ভেঙে বেরিয়ে আসার তেজের সাথে। নজরুল ইসলামের এই ঐতিহাসিক সৃষ্টিকে কোথাও ব্যবহার করতে চাইলে সবার আগে গানের এই বিদ্রোহী সত্তার প্রতি, বিপ্লবী তেজের প্রতি দায়বদ্ধ হতে হবে। মনে রাখতে হবে, পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে যখন গ্রেপ্তার করেছে ব্রিটিশ পুলিশ, তাঁর সম্পাদিত ‘বাঙ্গালার কথা’ পত্রিকার জন্য দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী দেবীর অনুরোধে এই গান লিখছেন নজরুল। যে নজরুলের কলমকে থামাতে ব্রিটিশের কারাগার তাঁকে বন্দি করেছে, জেলে বসেও যে বিদ্রোহী কবি অনশন-আন্দোলন জারি রেখেছেন। ‘ওরে ও তরুণ ঈশান বাজা তোর প্রলয় বিষাণ ধ্বংস-নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি’ বা ‘দে রে দেখি ভীমকারার ওই ভিত্তি নাড়ি’— এমন আগুনঝরা আখর যে গানের, তার সুর বদল করে খেয়ালখুশি মতো যে কোনও প্রেক্ষিতে নিছক বিনোদনের উপকরণ হিসাবে এ গান জুড়ে দেওয়া শুধু অজ্ঞতা নয়, অপরাধ। ‘পিপ্পা’য় ঠিক সেটাই করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এই উপমহাদেশের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ’৫২-র ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে মুক্তি আকাঙক্ষার উন্মেষ, তারই ধারাবাহিকতায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী জনগণ বুকের রক্ত ঢেলেছিলেন ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে। ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ’র শৌর্য, আত্মবলিদানের ইতিহাস আজও শোষিত মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণা। ‘পিপ্পা’ ছবিটি ‘মুক্তিযুদ্ধের যথার্থ ইতিহাসের সাথেও প্রতারণা করেছে। এ ছবিতে দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের শোষিত জনগণ নয়, ভারতীয় সেনারা সে দেশের মুক্তিযুদ্ধটা যেন লড়ে দিচ্ছে, সে দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তুলছে, যুদ্ধ করতে শেখাচ্ছে যেন শুধু তৎকালীন ভারত সরকারের বদান্যতাতেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সফল হচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষের এই যুদ্ধে তেমন কোনও ভূমিকা কিছু নেই— এই হচ্ছে মোটামুটি ছবির বয়ান। সেখানে ভারতীয় সেনা অফিসারদের মনোরঞ্জনের জন্য একটি নাচগানের আসরে মুক্তিযোদ্ধারা এমন অদ্ভুত পীড়াদায়ক সুরে ঝিমিয়ে পড়া তালে ছন্দে এই গান গাইছে। অর্থাৎ যা ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা জাগানো উদ্দীপনার গান, তাকে নামিয়ে আনা হল যে কোনও একটি আসরের গানের স্তরে। এক কথায় গানটি থেকে তার ইতিহাস এবং প্রাণসত্তাকে উপড়ে

চারের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) পুরুলিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলায় সাঁতুড়ি লোকাল কমিটির কর্মী লালগড় গ্রামের কমরেড গুরুপদ বক্সী ৩ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

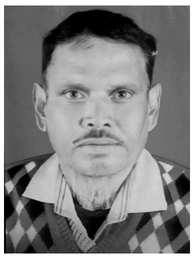

১৯৯৫-৯৬ সাল নাগাদ কমরেড গুরুপদ বক্সী দলের চিন্তার দ্বারা আকৃষ্ট হন ও ধীরে ধীরে কাজকর্মের সাথে সক্রিয় ভাবে নিজেকে যুক্ত করেন।

দলের আঞ্চলিক, জেলা ও রাজ্যস্তরে সংগঠিত বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ নিতেন, অন্যদেরও সেই সব কর্মসূচিতে অংশ নিতে উৎসাহিত করতেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার প্রতি তাঁর ছিল গভীর আস্থা। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন একদিন এই দলের নেতৃত্বেই শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

তাঁর সুমধুর ব্যবহার সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ করত। তাঁর অকাল প্রয়াণে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। অগণিত শুভানুধ্যায়ী তাঁকে শেষ বিদায় জানিয়ে যান। দলের পক্ষ থেকে মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সাঁতুড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদক ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কার্তিক মাজি ও লোকাল কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

কমরেড গুরুপদ বক্সী লাল সেলাম

মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লকের রুকুনপুর অঞ্চলে দলের কর্মী বিশ্বনাথ ঘোষ ৮ নভেম্বর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর।

কৈশোরে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রয়াত নেতা কমরেড মানিক মুখার্জীর সান্নিধ্য তাঁকে দলের প্রতি আকৃষ্ট করে। পরে ধীরে ধীরে তিনি যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র কাজের সঙ্গে যুক্ত হন এবং নিজেকে পার্টিকর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে থাকেন। দলের কর্মী-সমর্থকরা তাঁর কাছে ছিল নিজের পরিবারের সদস্যের মতোই। দলের কোনও নেতা-কর্মীর দোষ-ত্রুটি দেখলে হাসতে হাসতে তাঁর সামনেই তাঁকে বলতে কোনও দ্বিধা করতেন না। ২০১৩ সালে তাঁর ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসার পরে প্রায় ৭-৮ বছর দলের কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থাতেও দলের কাজকর্মের খোঁজ নিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল উন্নত মনের একজন কমরেডকে, এলাকার মানুষ হারাল তাঁদের স্বজনবন্ধুকে। ২ ডিসেম্বর রুকুনপুরে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড বিশ্বনাথ ঘোষ লাল সেলাম

কু-কথার লড়াই

একের পাতার পর

সাধারণ মানুষের সমর্থনও এই দলগুলির কাছে জরুরি। তাই জনস্বার্থের ভেক ধরে মাঝে মাঝেই এক দলকে গলা ফাটাতে হয় অপর দলের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে দিয়ে শাসক দল ও বিরোধী উভয় দলই মানুষের উদ্দেশে বার্তা দিতে চায়— ‘ওদের নয়, আমাদের সরকারে বসাও।’ আর জনসাধারণ বাধ্য হয় এই কুৎসিত কুনাট্যের দর্শক হতে।

নিজেদের যারা বামপন্থী বলে পরিচয় দেয় সেই সিপিএম-ও ক্ষমতায় থাকাকালে বিরোধীদের সঙ্গে সঙ্গে এমন আচরণই করেছে। বিরোধীদের প্রতি কুকথা বর্ষণে, ব্যক্তিগত নোংরা আক্রমণ হানতে তারাও কম যায় না।

অথচ এই দলগুলির একের বিরুদ্ধে অপরের কিছু বলার ছিল না, তা কিন্তু নয়। তৃণমূল কংগ্রেস দলটি যখন চুরি-দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে আছে, রাজ্যে যখন বেকার সমস্যা ভয়াবহ চেহারা নিয়েছে, চাকরিপ্রার্থীরা মাসের পর মাস ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন, শিক্ষা নেই, চিকিৎসা নেই, দারিদ্র, নারী নির্যাতন বাড়ছে তখন বিরোধী দল হিসাবে বিজেপি জনস্বার্থ রক্ষা করতে চাইলে এই বিষয়গুলি নিয়েই আন্দোলন গড়ে তুলতে পারত, জনস্বার্থবাহী দল হলে এ রাজ্যে বিজেপির তো সেই পথেই হাঁটা উচিত ছিল। আসলে সেই চরিত্রই তার নয়। তাই যে সব রাজ্যে তারা ক্ষমতায়, সেখানে খোদ বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরাই চূড়ান্ত চুরি-দুর্নীতির পাঁকে হাবুডুবু খাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলের নেতা স্বয়ং চুরি-দুর্নীতির অনেকগুলি অভিযোগে অভিযুক্ত। তা ছাড়া, এই ক’দিন আগেও যিনি নিজেই তৃণমূলের নেতা হিসাবে দলটির দুর্নীতিচক্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন, তাঁর পক্ষে চুরি-দুর্নীতি বন্ধে কার্যকরী বিরোধীতা কি আদৌ সম্ভব? তাই গলাবাজি ছাড়া বিরোধিতার অন্য পথ নেই তাঁদের। আবার একই কারণে বিজেপির বিরুদ্ধে নীতির ভিত্তিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয় তৃণমূল কংগ্রেসের। বিজেপি বিরোধিতাকে তাই বাধ্য হয়েই প্রায় নোংরা ভাষায় ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন তাদের নেতারা। এভাবেই রাজনৈতিক বিরোধিতা আজ এমন চরম অপসংস্কৃতির রূপ নিয়েছে। নেতাদের এই রুচিহীন আচরণ সামগ্রিকভাবে সমাজের রুচি-সংস্কৃতির মানটিকেও টেনে নামাচ্ছে।

শাসক-শোষক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাতের লক্ষ্যে ভারতে যে রাজনৈতিক সংগ্রামের সূচনা, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষ সেই রাজনীতিকে বলেছিলেন ‘উচ্চ হৃদয়বৃত্তি’। বলেছিলেন বিপ্লবী রাজনীতি হৃদয়বৃত্তির দিক দিয়ে আরও উচ্চতর। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে ব্রিটিশকে পরাস্ত করার বদলে আপস-হস্তান্তরের মাধ্যমে ভারতে স্বাধীনতা এল। ব্রিটিশের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতার দখল নিল দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণি। কায়েম হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা। কিন্তু ততদিনে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিকাশের যুগ পার হয়ে ঢলে পড়েছে অস্তের দিকে। মরতে বসা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হারিয়ে ফেলেছে তার সমস্ত প্রগতিশীল নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, উদারতা। আর এই পচা-গলা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটির সেবা করে চলেছে ভোটসর্বস্ব যে সব রাজনৈতিক দল, স্বাভাবিক কারণেই সেখানে আজ আর হৃদয়বৃত্তির ছিটেফোঁটাও যেমন খুঁজলে মেলে না, তেমনই সংস্কৃতিও কবেই হারিয়ে গেছে। তাই দুর্নীতি, ন্যক্কারজনক আচার-আচরণ, নিকৃষ্ট গলাবাজি, জোকারের মতো অঙ্গভঙ্গি, জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চরম মিথ্যাচার— এ সবই আজ প্রতিটি গদিলোভী রাজনৈতিক দলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রকাশ দেখা গেল বিধানসভা চত্বরে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির সাম্প্রতিক জঘন্য দ্বৈরথে। নির্বাচনের মাধ্যমে এদেরই একদলকে হঠিয়ে আরেক দলকে সরকারে বসিয়ে এই জঘন্য পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই অবস্থা বদলাতে চাই উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও রুচি-সংস্কৃতির ভিত্তিতে জনজীবনের দাবি নিয়ে সর্বব্যাপক সংগ্রামী বাম আন্দোলন। সঠিক বামপন্থী নেতৃত্বে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া জনসাধারণকে সংগঠিত করে দেশ জুড়ে এমন আন্দোলন গড়ে উঠলে তার উত্তাল স্রোতে ভেসে যাবে ক্ষমতালোভী রাজনীতির অঙ্গের ভূষণ এই কুৎসিত অশালীনতা, লজ্জাহীন কুকথা ও গলাবাজির সমস্ত আবর্জনা। সাগ্রহে সেই আন্দোলনের দিন গুনছেন দেশবাসী।

জানেন কি, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল আরএসএস

বিজেপি নেতারা ক্ষমতায় এসে নিজেদের জাতীয়তাবাদের চ্যাম্পিয়ন হিসাবে তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। কেন তাঁদের এই মরিয়া চেষ্টা? তবে কি গোড়াতেই কোনও গলদ আছে? দেখা যাক বিজেপির পূর্বসূরী হিন্দু মহাসভা এবং আদর্শগত অভিভাবক আরএসএস স্বাধীনতা সংগ্রামে কী ভূমিকা নিয়েছে।

১৯০৯ সালে গোপালকৃষ্ণ গোখলে পাঞ্জাবে হিন্দু সভা গঠন সম্পর্কে বলছেন, "এই আন্দোলন খোলাখুলি মুসলমান বিরোধী, যেমন মুসলিম লিগ খোলাখুলি হিন্দু বিরোধী এবং উভয়েই জাতীয়তাবাদ বিরোধী।"

১৯১৯-এ পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশের চালানো গণহত্যার পর সারা দেশ যখন এই গণহত্যার নিন্দায় মুখর তখন 'পাঞ্জাব হিন্দু সভা' রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। শুধু তাই নয়— ইতিহাস দেখাচ্ছে, জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যার পর সত্যাগ্রহের নামে 'এই অরাজকতার নিন্দা' করে তারা ব্রিটিশের প্রতি 'গভীর আনুগত্যের' শপথ নিয়েছিল (*কে এল তুতেজা- 'দ্য পাঞ্জাব হিন্দু মহাসভা অ্যান্ড কমিউনাল পলিটিক্স, ১৯০৬-১৯২৩', ফ্রন্টলাইন ১৪ মার্চ ২০০৩-নিউ ব্র্যান্ড অফ হিস্ট্রি, বিশ্বমোহন ঝা*)। ব্রিটিশ রাজের ভারত আগমনকে প্রণতি জানিয়ে তারা বলেছিল, 'ঈশ্বরের অসীম কৃপায় আর্যজাতির গুরুত্বপূর্ণ দুটি শাখা যা সুদূর অতীতে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, আবার এক হতে পেরেছে। এক জাতি অপরটিকে রাজনৈতিক পথনির্দেশ এবং সুরক্ষা প্রদান করছে। যে সাম্রাজ্যের সূর্য কখনও অস্ত যায় না, তার প্রজা হিসাবে আমরা গর্বিত এবং এই প্রাপ্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রমাণ করতে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট।' (ওই)

১৯২৫-এ নাগপুরে প্রতিষ্ঠা হয় আরএসএস। তখন থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনও কিছুতে অংশ নেওয়া দূরে থাক, তার বিরোধিতা করে গেছে তারা। আরএসএস-এর তাত্ত্বিক নেতা গোলওয়ালকার বলছেন, "...আমাদের দেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস এই কথাই বলে যে, সমস্ত কিছু করেছে একমাত্র হিন্দুরা। এর অর্থ কেবল হিন্দুরাই এই মাটিতে সন্তান হিসাবে এখানে বসবাস করেছে" (*চিন্তাচয়ন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৩-২৪*)। অথচ সেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে আরএসএসের বক্তব্য কী? এই গোলওয়ালকর স্বাধীনতা আন্দোলনের যোদ্ধাদের অভিহিত করেছেন 'বিশ্বাসঘাতক' বলে। তারই পাশাপাশি দাঙ্গাকারীদের দেখিয়েছেন 'দেশপ্রেমিক' হিসাবে। হেডগেওয়ার তাঁর 'তাত্ত্বিক' বই 'উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড'-এ মুসলমান বিদ্বেষের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। বইটির একটি মাত্র অনুচ্ছেদে ব্রিটিশ শাসনের উল্লেখ রয়েছে। এই উল্লেখটির উদ্দেশ্য হল 'ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদের' তীব্র সমালোচনা করা। তিনি বলেছেন, "আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ ও সর্বজনীন বিপদের তত্ত্ব থেকে আমাদের জাতিত্বের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে আমাদের প্রকৃত হিন্দু জাতিত্বের সদর্থক অনুপ্রেরণা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু আন্দোলনই নিছক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধিতার সঙ্গে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদকে সমার্থক করে দেখা হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে, তার নেতৃবর্গ এবং সাধারণ মানুষের ওপরে এই প্রতিক্রিয়াশীল মতের প্রভাব সর্বনাশা হয়েছে।" তিনি বলছেন, "স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেকগুলিকেই কার্যত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত করা হয়েছিল। ব্রিটিশ বিরোধিতাকে ভাবা হয়েছে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সমার্থক। এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন, তার নেতৃবর্গ ও সাধারণ মানুষের ওপর বিনাশকারী প্রভাব ফেলেছে (*চিন্তাচয়ন, ১ম খণ্ড, পৃঃ১২৫*)।

আরএসএস-এর অন্যতম নেতা ডাঃ কেশবরাও হেডগেওয়ার বা ডাক্তারজি বলছেন, "অদ্ভুত, ভারী অদ্ভুত যে, বিশ্বাসঘাতকদের জাতীয় বীররূপে সিংহাসনে বসানো হয় এবং দেশপ্রেমিকদের উপর কলঙ্ক নিক্ষেপ করা হয়"। আর এস এস প্রকাশিত তাঁর জীবনীগ্রন্থে বলা হয়েছে, "১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্যের ডাক দিয়েছিলেন। ডাঃ হেডগেওয়ার সব জায়গায় খবর পাঠালেন, এই সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করবেন না। ... এর অর্থ হল সংঘের কোনও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না" (*সি পি ভিশিকর, ডাঃ কেশব রাও হেডগেওয়ার, নিউ দিল্লি, ১৯৯৪, পৃঃ ২০*)। এই জীবনী গ্রন্থই দেখাচ্ছে, যে যুবকরা তাঁর কাছে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পরামর্শ নিতে আসত, তিনি তাদের নানাভাবে নিরুৎসাহিত করে সংঘে যোগ দিতে বলতেন। তা হলে তিনি নিজেই অমান্য আন্দোলনে হঠাৎ যোগ দিয়েছিলেন কেন? সেখানেও ছিল আন্দোলনকে ভাঙার পরিকল্পনা। ইতিহাস বলছে, "ডাক্তারজি চিন্তা করে দেখলেন যে এই সময়ে সম্পূর্ণ সমাজের মন্থন হয়ে দেশভক্তিপূর্ণ যথার্থ কর্মকর্তারা কারাগারের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একত্রিত হবেন। যদি এই রকম সম্ভাবনাময় তথা দেশভক্তির ভাবনাযুক্ত তরুণ কর্মকর্তাদের ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে সংঘের দিক থেকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে এক এক জনকে খুঁজে বেড়াবার থেকে অধিক লাভজনক কাজ হবে।" (*জীবন চরিত, ডাঃ হেডগেওয়ার, নারায়ণ হরি পালকর, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ২০৬*)।

উল্লেখ্য, আরএসএস-এর ছয়টি উৎসব বা পরবের মধ্যে চারটিই হিন্দুদের প্রথাগত উৎসব এবং একটিতেও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কথা নেই।

আরএসএস-বিজেপির আইকন হিন্দু মহাসভার নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর প্রথম জীবনে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করলেও অল্পদিনের মধ্যেই সে পথ ছেড়ে দেন। ১৯২০-এর দশকের সমসাময়িককাল থেকে তিনি 'হিন্দুত্বের' তাত্ত্বিক নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ব্রিটিশ বিরোধিতা ত্যাগ করেন। এই সময় তিনি ব্রিটিশের কাছে মুচলেকাও দেন। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় সাভারকর বিভিন্ন পৌর ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, আইনসভা এবং বিভিন্ন চাকরিতে হিন্দু মহাসভার সদস্যদের—নিজ নিজ পদে অবিচল থেকে দৈনন্দিন কাজকর্ম করে যেতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময়ে তাঁর স্লোগান ছিল, 'রাজনীতির হিন্দুকরণ এবং হিন্দুধর্মের সামরিকীকরণ'। যখন সারা দেশের জনগণ ব্রিটিশ শাসনের অবসান চেয়ে আন্দোলনে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, **আজাদ হিন্দ বাহিনী নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে জীবনপণ করে লড়ছে, সেই সময় সাভারকর ১৯৪১-এ হিন্দু মহাসভার ভাগলপুর অধিবেশনে বলছেন, "...ভারত সরকারের সমস্ত যুদ্ধ প্রস্তুতিকে হিন্দুদের অবশ্যই দ্বিধাহীন চিত্তে সমর্থন করতে হবে"** (*সাভারকর সমগ্র, খণ্ড ৬, মহারাষ্ট্র প্রান্তিক হিন্দুসভা প্রকাশিত, পৃঃ ৪৬০*)। **সাভারকরের না জানার কথা নয় ব্রিটিশের হয়ে যুদ্ধ মানে তখন উত্তরপূর্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করা। কিন্তু তিনি ডাক দিচ্ছেন, "...হিন্দু বন্ধুরা আসুন, হাজারে হাজারে লাখে লাখে যোগ দিন সামরিকবাহিনীতে, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীতে"** (*বিনায়ক দামোদর সাভারকরস হোয়াইরল উইন্ড প্রোপাগান্ডা—এএস ভিড়ে, পৃঃ২৬*)। এই গোলামির পুরস্কার হিসাবে ভাইসরয়ের প্রতিরক্ষা কাউন্সিলে সাভারকরের পছন্দমতো লোক মনোনীত করা হয়েছিল। তিনিও ভাইসরয়কে টেলিগ্রাম করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। (*ওই, পৃঃ ৪৫১*)

১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে হিন্দু মহাসভার নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলেছিলেন, "আমি মনে করি না যে, গত তিন মাসের মধ্যে যেসব অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নাশকতামূলক কাজ করা হয়েছে তার দ্বারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভে সহায়তা হবে।" আরও একধাপ এগিয়ে তিনি মিত্রশক্তিকে অর্থাৎ ব্রিটিশকে সহযোগিতা করার কথাও বলেছিলেন, "এখন যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতবর্ষের ... জাতীয় গভর্নমেন্ট এমনভাবে গঠিত হবে, যাতে মিত্রপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতার সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব হবে" (*রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী*)। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর একটি চিঠি সংযুক্ত করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ লিখছেন ব্রিটিশের বিপদ তাঁদেরও বিপদ। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারকে লিখছেন, "বঙ্গদেশকে রক্ষা করিবার জন্য একটা গৃহবাহিনী গঠনের অধিকার আমাদের দেওয়া হউক। ... বর্তমানে প্রবল বিপদ আমাদের দ্বারে হানা দিয়াছে। ... আজ আমাদের গুরুতর প্রয়োজনের সময়েও যদি সৈন্যবাহিনী গঠনের অধিকার দিতে আপনারা অস্বীকৃত হন তবে ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে আপনারা অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন।" প্রসঙ্গত, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর গঠিত জনসংঘ থেকেই জন্ম বিজেপির।

সংঘ পরিবারের ব্রিটিশ সহযোগিতার আরও স্পষ্ট প্রমাণ মেলে ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তর থেকে। ১৯৪০ সালের ২ ডিসেম্বর বম্বে প্রদেশের স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে আরএসএস নেতা অভয়ঙ্কর ও অন্যান্যদের আলোচনার ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নোটে বলা হয়েছে, 'অভয়ঙ্কর আরএসএস-এর পোশাক, কুচকাওয়াজ ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি নিষেধাজ্ঞা মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দান করেন। তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দেন যে, সংঘ তার সদস্যদের বৃহত্তর সংখ্যায় সিভিক গার্ডে যোগ দিতে উৎসাহ দেবে। এই মর্মে বোঝাপড়া হয় যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্যরা সিভিক গার্ডে যোগদান করলে সিভিক গার্ডের প্রতি তাদের দায়িত্বকে সার্বভৌম বলে গ্রহণ করবে।' '৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পর ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪, বোম্বের স্বরাষ্ট্র সচিব এইচ ভি আঙ্গোয়ার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জানান যে, 'সংঘ নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে সরকারি আইনের চৌহদ্দির মধ্যে রেখেছে ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ১৯৪২ সালে যে গোলমাল শুরু হয়েছিল সংঘ তাতে কোনও রকম অংশগ্রহণ করেনি।' ১৯৪৬ সালের ১৯ জুন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রদপ্তরের একটি নোটে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সংগ্রাম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নয়। হিন্দু মহাসভার ১৯৩৩ সালের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ভাই পরমানন্দ অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বলেছেন, "সরকারের বিরোধিতা করে সরকারি শুভদৃষ্টি হারানো হিন্দুদের অনুচিত হবে। বিশেষত যখন সরকার দৃঢ়ভাবে ক্ষমতাসীন এবং কৃপা করার মনোভাবও সরকারের আছে।" ১৯৩৯ সালে ভি ডি সাভারকর গোপনে ভাইসরয়কে জানান যে, "ব্রিটিশ ও হিন্দুদের পরস্পর বন্ধু হওয়া উচিত।"

১৯৪২-এর আন্দোলনে বিজেপি নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী কী ভূমিকা নিয়েছিলেন? তিনি ওই বছর ২৭ আগস্ট যুক্তপ্রদেশের (এখন উত্তরপ্রদেশ) আগ্রা জেলার বটেশ্বর গ্রামে হওয়া গণবিক্ষোভের ব্যাপারে পুলিশকে মুচলেকা দিয়েছিলেন ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪২। তিনি আন্দোলনের নেতা লীলাধর বাজপেয়ীর নাম ফাঁস করে দিয়ে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাঁর বয়ান, "আমি একজন দর্শক ছিলাম ও সরকারি ভবন ভাঙার কাজে আমি কোনও ভাবেই অংশগ্রহণ করিনি এবং লীলাধর বাজপেয়ী ছাড়া আর কারুর নাম আমি জানি না।" এই স্বীকারোক্তি পুলিশ সরাসরি আদালতে পেশ না করলেও এই বয়ানকে ভিত্তি করেই সরকারি উকিল সওয়াল করেছিলেন। ফলে লীলাধর বাজপেয়ীর ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় ও গোটা গ্রামের ১০ হাজার টাকা জরিমানা হয়।

দেশভাগের জন্যও মুসলিম লিগের সাথে সমান দায়ী আরএসএস-হিন্দুমহাসভা ও জনসংঘ। মুসলিম লিগ ১৯৪০-এর ২৩ মার্চ তাদের লাহোর অধিবেশনে দেশভাগের দাবি তুলেছিল। কিন্তু তার ঢের আগে ১৯২৩-এ সাভারকর 'হিন্দুত্ব' নামক বইতে এই দ্বিজাতি তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাই বলেছেন, 'সাম্প্রদায়িক পথে ভারত বিভাগের ধারণাটির উদ্ভাবনের জন্য বিপুল পরিমাণে দায়ী হল হিন্দু মহাসভা।' তিনি আরও বলেন, 'মুসলিম লিগ সাভারকরের ওই বক্তব্যকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেছিল।' উল্লেখ করা দরকার, হিন্দু মুসলিম বৈরিতার যত স্লোগানই জনসংঘ এবং হিন্দু

ছয়ের পাতায় দেখুন

লেনিন মৃত্যু শতবর্ষে ছাত্রদের আলোচনা সভা

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার ও মহান দার্শনিক কমরেড লেনিনের প্রয়াণ শতবর্ষে এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র 'ছাত্র সংহতি'র পক্ষ থেকে ৭ ডিসেম্বর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কে পি বসু মেমোরিয়াল হলে।

'কমরেড লেনিনের স্বপ্ন, বিপ্লব প্রস্তুতি ও বিপ্লবী মুখপত্র' শীর্ষক এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী ও শিক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডঃ মৃদুল দাস ও এআইডিএসও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ডাঃ শুভঙ্কর চ্যাটার্জী। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলার পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী সভায় মহান লেনিনের স্বপ্নকে রূপায়িত করার সংকল্প নেয়।

হাসপাতালে শিশুমৃত্যু তদন্তের দাবি

মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৬ এবং ৭ ডিসেম্বর ২৪ ঘন্টায় ৯টি নবজাতক সহ ১০টি শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। পরের ২৪ ঘন্টায় আরও চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই মর্মান্তিক মৃত্যুর তদন্ত দাবি করে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ও এমএসভিপি-র কাছে ৩ জনের প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি দেন।

অভিভাবকদের অভিযোগ, হাসপাতালের শিশু বিভাগে বেডের দ্বিগুণ রোগী ভর্তি। শিশু বিভাগে, এমনকি এসএনসিইউ-তেও ডাক্তারদের রাউন্ড অনিয়মিত। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের জেলা সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম এসএনসিইউ-এ ডাক্তারদের রোস্টার তৈরি এবং নবজাতকদের পরবর্তী ফলোআপের জন্য যাতে হয়রান হতে না হয়, সেজন্য সকাল সন্ধ্যে রুটিন চেক আপের ব্যবস্থার দাবি জানান। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, মেডিকেল কলেজ সহ সমস্ত মহকুমা বা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে এসএনসিইউ সহ নবজাতকের চাহিদা অনুযায়ী বেড চালু করতে হবে, মহকুমা বা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফারাল ব্যবস্থার উন্নতি, শিশুমৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে ইত্যাদি। দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ভোগপুর স্টেশনে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ জানায় মেদিনীপুরে ভোগপুর হাইস্কুলের সামনে লেভেল ক্রসিংয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাড়া অন্যদের পারাপার ও সব রকম যানবাহন চলাচল বন্ধ হবে। ২ ডিসেম্বর সকালে তারা লোহার খুঁটি পুঁতে রাস্তা বন্ধ করবে জানতে পেরে ভোগপুর লেভেল ক্রসিং নির্মাণ ও উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ সভার ডাক দেওয়া হয়। দাবি করা হয়, যতদিন না ওই স্থানে গেটম্যান সহ লেভেল ক্রসিং নির্মাণ হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের যাতায়াত সহ ছোট গাড়ি যাতায়াতের ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। কমিটির পক্ষ থেকে ভোগপুরের স্টেশন ম্যানেজার অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ছয় দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

নজরুলের গানের বিকৃতি

দুয়ের পাতার পর

ফেলা হল। এবং তা সংলগ্ন হয়ে রইল এমন একটি ছবির সাথে, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের আবরণে আজকের উগ্র দেশপ্রেমের ছবির মতো রাষ্ট্রের সেনামাহাত্ম্য বর্ণনাই মূল উদ্দেশ্য। কাজেই, 'কারার ওই লৌহকপাট'-এর এই প্রয়োগকে 'শিল্পীর স্বাধীনতা', 'মানুষ না চাইলে শুনবে না', 'পরিবারের অনুমতি' বা 'কপিরাইট' এসব প্রশ্ন দিয়ে লঘু করে দেখা চলে না। ছবির আখ্যান এবং উপস্থাপনার সাথে যুক্ত করেই একে বিচার করতে হবে। কোনও কালজয়ী শিল্পসৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেউ করতেই পারেন, কিন্তু তা করতে হবে সেই সৃষ্টির মর্মবস্তুকে অক্ষুণ্ণ রেখে তার আবেদনকে আরও জোরালো, কার্যকরী করার উদ্দেশ্যেই। পিপ্পা ছবিতে গানটি ব্যবহারের এমন কোনও উদ্দেশ্য ছিল না এবং স্বভাবতই গানটি কোনও আবেদন তৈরি করতে পারেনি, বরং সচেতন রসিক শ্রোতার বিরক্তি উৎপাদন করেছে। সঙ্গতভাবেই বহু মানুষ এবং শিল্পী-সাংস্কৃতিক সংগঠন এর প্রতিবাদ করেছেন, গানটি প্রত্যাহারের বা প্রয়োজনে মূল সুর ও ভাব অক্ষুণ্ণ রেখে ব্যবহারের দাবি উঠেছে।

এ আর রহমানের মতো গুণী সুরকার নজরুল ইসলামের জীবন ও রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে কিছু না জেনেই এমনটা করে ফেলেছেন এ কথা বিশ্বাস করা কষ্টকর। বরং নিজের ক্ষমতাকে তিনি যেভাবে ব্যবহার করলেন বা ব্যবহৃত হতে দিলেন, তা খুবই দুঃখজনক। এই ঘটনা আবারও শিখিয়ে গেল, শিল্পীর দক্ষতা এবং প্রতিভার সাথে তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নটিও অত্যন্ত জরুরি।

চারণিক আয়োজিত
নাট্য উৎসব
সহযোগিতায় পিসিএআই
১৯-২০ ডিসেম্বর, মুক্তাঙ্গন, কলকাতা

কেরালায় সিপিএম সরকার চালু করছে স্মার্ট মিটার

বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার লাগানোর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন করছেন গ্রাহকরা। অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) স্মার্ট মিটার চালুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে সব স্তরের গ্রাহকদের ঐক্যবদ্ধ করে। কেন তা গ্রাহক স্বার্থবিরোধী, তা বোঝা দরকার সব স্তরের মানুষের।

১) এই মিটার ব্যবস্থায় বিলের হার্ড কপি দেওয়া হবে না। ফলে গ্রাহক কত ইউনিট খরচ করেছে, তার দাম কত, মিটার ভাড়া কত, ফিক্সড-মিনিমাম চার্জ কত, অন্যান্য কোন চার্জ নেওয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে গ্রাহক জানতে পারবে না। ২) প্রি-পেইড মিটারে টাকা আগে দিলে তবে বিদ্যুৎ আসবে, যা বিদ্যুৎকে পরিষেবার পরিবর্তে সাধারণ পণ্যের স্তরে নামিয়ে আনবে। ৩) গ্রাহকের জমা টাকা শেষ হয়ে গেলেই তৎক্ষণাৎ কোনও নোটিশ ছাড়াই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে (এমনকি মধ্যরাতে পর্যন্ত)। ৪) প্রথমে পোস্ট-পেইড, তারপর প্রি-পেইড, টিওডি সিস্টেমে বিল, তার সাথে ডায়নামিক ফেয়ার প্রাইসিং-এর (চাহিদা যখন যেমন বাড়বে দামও তখন তেমন বাড়বে) ফলে গ্রাহককে বাড়তি টাকা গুনতে হবে। ৫) স্মার্ট মিটার আসায় বহু ব্যয়ে বানানো বর্তমান ডিজিটাল মিটারগুলো ফেলে দেওয়া হবে। এই মিটার কৃত্রিম মেধার কন্ট্রোলে থাকবে, যার মাধ্যমে কোম্পানির সীমাহীন মুনাফার লালসায় স্মার্টলি গ্রাহকের টাকা লুট হবে। ৬) স্মার্ট মিটার খারাপ হলে তার পরিবর্তন ও বিল সংশোধন করা অসম্ভব হবে। এই মিটারের স্থায়িত্ব ৫-৭ বছর। তখন আবার মিটার পরিবর্তনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে, যার দায়ভার গ্রাহকদের উপরেই পড়বে। ৭) বেসরকারি কোম্পানিগুলির হাতে স্মার্ট মিটারের টাকা জমা নেওয়ার ভার থাকায় রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি কার্যত অচল হয়ে যাবে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সার্বিক বেসরকারিকরণ ত্বরান্বিত হবে। ৮) বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ অনুযায়ী স্মার্ট মিটার লাগানো বাধ্যতামূলক নয়, গ্রাহকের ইচ্ছাধীন। ডিজিটাল মিটার সূক্ষ্মভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাপ করতে সক্ষম হলেও তা বাতিল করে স্মার্ট মিটার লাগানো হচ্ছে। এর থেকে বোঝাই যাচ্ছে, স্মার্ট মিটার অত্যন্ত জনবিরোধী, কৃষকবিরোধী, কর্মচারী বিরোধী এবং শিল্পবিরোধী।

পশ্চিমবঙ্গে স্মার্ট মিটার লাগানোর উদ্যোগ চলছে সর্বত্র। বহু জায়গায় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা মিটার লাগাতে এসে গ্রাহকদের বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন। অ্যাবেকার নেতৃত্বে আন্দোলনে গ্রাহকরা সংঘবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, বহু জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। **গ্রাহকদের আন্দোলন করতে দেখে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে ক্ষমতালোভী সিপিএম। যে সিপিএমের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুই গ্রাহক স্বার্থের তোয়াক্কা না করে শিল্পপতি গোয়েঙ্কার হাতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে তুলে দিয়েছিল। সেই সিপিএম এখন জনগণের ক্ষোভ লক্ষ করে স্মার্ট মিটার লাগানোর বিরোধিতা করছে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও অন্যান্য রাজ্যে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই দ্বিচারিতা শুধুমাত্র ভোটের দিকে লক্ষ রেখেই। সে জন্যই কেরালাতে ক্ষমতায় থাকা সিপিএম স্মার্ট মিটারের পক্ষে সওয়াল করেছে শুধু নয়, কেরালা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এই মিটার লাগানোর নোটিস জারি করেছে।**

ফলে এ কথা স্পষ্ট যে, জনস্বার্থের উপর এমন একটি আক্রমণের বিরুদ্ধে যথার্থ প্রতিবাদ এমন দ্বিচারী কায়দায় হতে পারে না। তাই যে সমস্ত সিপিএম সমর্থক আন্তরিক ভাবে চাইছেন স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হোক, তারা নেতৃত্বের এই দ্বিমুখী ভূমিকায় ব্যথিত। স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সাধারণ গ্রাহকরা সোচ্চার। এই আন্দোলনকে সঠিক পথে প্রবাহিত করতে হলে দরকার আন্দোলনের প্রশ্নে একাগ্র, নিষ্ঠাবান সংগঠনকে চিনে নেওয়া, তাদের হাতকে শক্তিশালী করা। বিদ্যুৎ আন্দোলনের নির্ভরযোগ্য সংগঠন হিসাবে অ্যাবেকা লাগাতার সেই ভূমিকা পালন করছে।

গ্রাহকদের প্রতিরোধ

একের পাতার পর

দিয়ে চিঠি দেন। অ্যাবেকার পক্ষ থেকে এলাকায় এর প্রতিবাদে মাইক প্রচার করে গ্রাহকদের সংগঠিত করে বিদ্যুৎ অফিসে চিঠি প্রত্যাহারের দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখানো হয়। স্টেশন ম্যানেজার আর কাউকে এরকম চিঠি দেবেন না বলে আশ্বাস দিতে বাধ্য হন।

৭ ডিসেম্বর হুগলি জেলায় আরামবাগ সিসিসি-র উল্লাসপুরে একটি গ্রিল কারখানায় স্মার্ট মিটার নিয়ে কোম্পানির লোকেরা গ্রাহকের অনুপস্থিতিতে মিটার ঘর ভেঙে ডিজিটাল মিটারের লাইন কেটে দেয়। খবর পেয়ে ওই গ্রাহক ও এলাকার অন্যান্য সাধারণ গ্রাহকরা দলবদ্ধভাবে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে কোম্পানির গাড়ি আটকে দেয়। শেষপর্যন্ত পুরনো মিটারেই পুনরায় বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে কোম্পানি বাধ্য হয়।

পূর্ব বর্ধমান জেলার শক্তিগড় সিসিসি-র রসুলপুরে ক্ষুদ্রশিল্প গ্রাহকদের স্মার্ট মিটার লাগাতে এসেও গ্রাহক-প্রতিরোধে কোম্পানির লোকেরা মিটার না লাগিয়েই ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

হাওড়া গ্রামীণ জেলার অমরাগোড়ী, বীরশিবপুর, পাঁচলা, উলুঘাটা সহ সাতটি সিসিসিতে মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়ে স্মার্ট মিটার লাগাতে এসেছিল কোম্পানি। কেউ কেউ কারখানা বন্ধ করে রেখেছিল, বাকিরা প্রবল আপত্তি জানিয়ে কোম্পানির লোকেদের ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন।

হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া সিসিসি-র টিন্না ও কালনা রোডের জনৈক গ্রাহক অমূল্য মণ্ডল এবং অরুণ দে প্রবল আপত্তি জানিয়ে তাদের ক্ষুদ্রশিল্পে স্মার্ট মিটার লাগাতে দেননি।

৮ ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরের তোলাপাড়ায় হাস্কিং মেশিনের মালিক অজয় সিংহের দোকানে স্মার্ট মিটার লাগাতে আসেন বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মচারীরা। তিনি বাড়িতে না থাকায় বাড়ির মহিলারা মিটার লাগাতে বাধা দেন। জোর করে লাগানোর চেষ্টা করেন কর্মচারীরা। খবর পেয়ে রাজাবাজার এলাকার ক্ষুদ্রশিল্প তথা অ্যাবেকার নেতা সৌমেন সাহা উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ সংগঠিত করায় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মচারীরা পিছু হটতে বাধ্য হন।

পুরুলিয়ায় শহিদ-স্মরণ

১৯৭৫ সালের ৪ ডিসেম্বর পুরুলিয়া জেলার নেতুড়িয়া ব্লকের বেনাম জমি উদ্ধার করে গরিব মানুষের মধ্যে বিলি ও জমির ফসল রক্ষা আন্দোলনে শহিদ হয়েছিলেন কমরেড রামযতন সিং ও গুহিরাম বাউরি। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও এই দুই শহিদ স্মরণে এস ইউ সি আই (সি) পুরুলিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির উদ্যোগে ৪ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ স্মরণ দিবস পালিত হয় গোবাগ মোড়ে। পুরুলিয়া বরাকর রোড সংলগ্ন শহিদ বেদিস্থলে এই সভা হয়। এলাকার সাধারণ মানুষ সহ দলের শতাধিক কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান কমরেড হরিশংকর মণ্ডল। বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কমল সাঁই এবং পুরুলিয়া (উত্তর) সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড লক্ষ্মীনারায়ণ সিনহা। কমরেড কমল সাঁই বলেন, আমাদের কাছে এই শহিদদের সংগ্রামী জীবন প্রেরণার উৎস।

পশ্চিম বর্ধমানে জেলা যুব সম্মেলন

ভয়াবহ বেকারত্ব, সীমাহীন দুর্নীতি, অপসংস্কৃতি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জেলায় ও রাজ্যে দুর্বার যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে ৩ ডিসেম্বর মহান বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ১৩৫তম জন্মদিবসে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে জেলা গ্রন্থাগার সভাকক্ষে প্রথম জেলা যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলন শুরুর আগে প্রতিনিধিরা এক মিছিলে সামিল হন।

বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বদেশপ্রিয় মাহাতো এবং মূল বক্তা রাজ্য সম্পাদক কমরেড মলয় পাল। কমরেড স্বপন মুন্সিকে সভাপতি এবং কমরেড শঙ্খ কর্মকারকে সম্পাদক করে ১৪ জনের জেলা কমিটি ও ২০ জন কাউন্সিল সদস্য নিয়ে ৩৪ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রকাশিত বই পাওয়া যাবে

কলেজ স্ট্রিটে

●

প্রমিথিউস পাবলিশিং হাউস ও গণদাবী পাবলিশার্স

ব্লক নং-৪, স্টল নং-১৫,
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
যোগাযোগ
৮১৪৫৪৩২৯৪৯, ৪৮২০৬০০১৮

মাঠের খেলার চেয়ে পিছনের টাকার খেলাই বড়

৫ অক্টোবর থেকে ১৯ নভেম্বর দীর্ঘ দেড় মাসব্যাপী ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এক-দিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া রেকর্ডসংখ্যক ছয় বার চ্যাম্পিয়ন হল। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা দেশের মাটিতে কাপ-জয়ের দোরগোড়ায় এসে এই পরাজয়ে দুঃখ পেতে পারেন। কিন্তু খেলায় জয়-পরাজয় আছেই। ১৯ নভেম্বর ফাইনালে ক্রিকেটের সব বিভাগেই যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয়েছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিপক্ষ দেশের লক্ষাধিক দর্শকের সামনে টুর্নামেন্টে একটানা অপরাজিত থাকা একটি দলকে হারানো নিশ্চিতভাবেই তারিফযোগ্য। কিন্তু দেখা গেল, অস্ট্রেলিয়ার জয়ের সম্ভাবনা স্পষ্ট হতেই স্টেডিয়াম নীরব হয়ে গেল। বহু দর্শক খেলা শেষ হওয়ার আগেই মাঠ ছাড়লেন। যাঁরা বসে থাকলেন, তাদের মুখও ছিল ম্রিয়মান। অস্ট্রেলীয়রা বাউন্ডারি মারলে মাঠে ছিল শ্মশানের নীরবতা। কঠিন পিচে শক্তিশালী ভারতীয় বোলিংয়ের মোকাবিলা করে ট্রাভিস হেড যখন অসাধারণ সেঞ্চুরি করলেন, তখন কয়েকটা মাত্র হাততালির শব্দ শোনা গেল। যে ফাইনাল ম্যাচের টিকিটের চাহিদা ছিল আকাশচুম্বী, এমনকি পুলিশের নাকের ডগায় লাখ লাখ টাকায় যে ম্যাচের টিকিটের কালোবাজারি হয়েছে, সেই ম্যাচের পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠান পর্যন্ত অপেক্ষা করার ইচ্ছে দর্শকদের একটা বড় অংশেরই ছিল না। এই মনোভাবকে আর যাই বলা যাক, খেলোয়াড়োচিত নিশ্চয়ই বলা যাবে না। বিশ্বকাপ ফুটবল কিংবা অলিম্পিক গেমসের সাথে তুলনা করলে যে কারও ধারণা হবে ভারতীয় দর্শকরা বোধহয় বিপক্ষের সাফল্যকে সম্মান জানাতে ভুলে গিয়েছে! ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক নাসের হুসেন বলেছেন, মনে হচ্ছিল একটা ফাঁকা স্টেডিয়ামে খেলা হচ্ছে। ভারতীয় ফ্যানদের অন্তত একটু লজ্জিত হওয়া উচিত। অথচ ১৯৮৩ সালে ইংল্যান্ডের মাঠে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে সন্দীপ পাতিল যখন উইনিং স্ট্রোক নিচ্ছেন, তখন বব উইলিসের নেতৃত্বে গোটা ইংল্যান্ড দল হাততালি দিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছিল। এমনটাই তো হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতে ক্রিকেটকে এখন খেলার পরিবর্তে একটা যুদ্ধে পরিণত করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে দেশের শাসক দলের নেতাদের ভঙ্গিমা— সব ক্ষেত্রেই খেলাকে কেন্দ্র করে একটা 'যুদ্ধং দেহি' ভাব। জুড়ে যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক মনোভাবও। মহম্মদ শামি খারাপ পারফর্ম্যান্স করলে তার ধর্ম নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে, 'হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটিতে' খোঁচা দেওয়া, ট্রোল করা চলছে। 'ভারত বনাম পাকিস্তান' যে কোনও ম্যাচকে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বানিয়ে তুলছে দেশের শাসকরা। খেলা নিয়ে উন্মাদনার বন্যায় দেশের মানুষকে ভাসিয়ে দিয়ে জীবনের মূল সমস্যাকে ভুলিয়ে দেওয়া— এ সব দীর্ঘ দিন ধরে চলছে।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে (২০২৩) যে দলই জিতুক না কেন, তাতে বিশ্ব ক্রিকেট সংস্থা আইসিসি কিংবা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ধনী ক্রিকেট সংস্থা ভারতের বিসিসিআই-এর রোজগারে কোনও পরিবর্তন আসবে না। ব্যাঙ্ক অফ বরোদার হিসাব অনুযায়ী, এবারের প্রতিযোগিতার ব্রডকাস্টিং রাইটস থেকে আইসিসি পেয়েছে ৩৫০০ থেকে ৪০০০ কোটি টাকা। স্পনসরশিপ থেকে আয় ১২৫০ কোটি টাকা। পুরস্কারমূল্য বাবদ আইসিসিকে দিতে হয়েছে ৮৩ কোটি টাকা। এই প্রতিযোগিতা থেকে আইসিসি-র উপার্জন ১০-১২ হাজার কোটি টাকা। তাদের পক্ষ থেকে আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল ২০২৪ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত আইসিসি তার মোট উপার্জনের ৩৮.৫ শতাংশ ভারতকে দেবে। সেই অনুযায়ী এবারের মেগা টুর্নামেন্ট থেকে বিসিসিআই-এর লাভ প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে আছে টিকিট বিক্রি বাবদ প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। বিসিসিআই ১০টি ক্রিকেট স্টেডিয়াম সাজানোর জন্য ৫০ কোটি টাকা দিয়েছে। কিন্তু, সব খরচ করেও বিসিসিআই বিপুল আর্থিক মুনাফা করেছে। আর এর ফলেই তারা আইসিসিকে নিজেদের মর্জিমাফিক ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পিচ বদল থেকে শুরু করে আয়োজক দেশের সুবিধা অনুযায়ী পিচ বানানো ইত্যাদি অভিযোগ তুলেছে সংবাদমাধ্যমের একাংশ। যদিও আইসিসি সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতার অভাব

সমগ্র পৃথিবীতেই ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, কুস্তি, বক্সিং, অ্যাথেলেটিক্স— বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়াকে কেন্দ্র করে শরীরচর্চা যেমন হয়েছে, তেমনই এর মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধের প্রকাশও ঘটেছে। খেলার সঙ্গে চর্চা হয়েছে বৌদ্ধিক-শক্তি, একতাবোধ, খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতার। এসব কিছু মিলিয়ে ক্রীড়া একটি উন্নত শিল্প রূপেই সমাদৃত বিশ্ব জুড়ে। অলিম্পিকের আসরে শুরু থেকে জড়িয়ে ছিল এক উন্নত নৈতিকতা। পেশাদারি খেলার জগতেও এই নৈতিকতার চর্চা হয়েছে। ফুটবলের সর্বোচ্চ আসরে বিপক্ষের গোলকিপার বা ডিফেন্ডার মাঠে পড়ে গেলে নিশ্চিত গোল উপেক্ষা করে রেফারিকে খেলা থামানোর অনুরোধ করছেন ফরোয়ার্ড— এমন ঘটনা বিরল নয়। খেলার নৈতিকতা বলে খেলায় জেতাটাই বড় কথা নয়, অংশগ্রহণটাই বড়— এমন ঘটনাও আছে। স্পেনের বুর্লাডায় অনুষ্ঠিত আন্তর্দেশীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায়। স্পেনের অ্যাথেলিট ইভান ফার্নান্ডেজ অ্যানায়া দ্বিতীয় স্থানে দৌড়তে দৌড়তে লক্ষ করেন প্রথম স্থানে থাকা কেনিয় প্রতিযোগী আবেল মুতাই দৌড় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে ভেবে ভুল করে ১০ মিটার আগে থেমে গেছেন। ভুলের সুযোগ নিয়ে সহজেই জিততে পারতেন ইভান। কিন্তু তিনি ভুলটা বুঝিয়ে দিয়ে আবেলকে সাহায্য করেছেন জিততে। কেন তিনি এমন করলেন জিজ্ঞাসা করায় ইভান বলেন, 'আমি ওই জয়ের যোগ্য ছিলাম না।' ক্রিকেটেও এমন ঘটনা আছে।

ক্রিকেট এখন পণ্য

সত্তরের দশকের ধনকুবের কেরি প্যাকারের টাকার আনুকুল্যে বেশ কিছু নামী ক্রিকেটার বর্ণবৈষম্যবাদী তৎকালীন দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। সঠিকভাবেই মানুষ প্রশ্ন তুলেছিল, 'টাকা রোজগার করাটাই কি বড় কথা?' আর আজ আইপিএল-এর জন্য ক্রিকেটার নিলাম হচ্ছে। ক্রিকেটাররা যেন 'হস্তিনাপুর রাজসভা'য় পাশা-খেলার পণের সামগ্রী। এখন বর্ষাকালেও ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতার আগে-পরে ঠাসা ক্রীড়াসূচি থাকছে প্রায় সব দলের ক্রিকেটারের। ফলে পারফর্ম্যান্সে প্রভাব পড়ছে। ভারতের অধিনায়ক থেকে শুরু করে বর্তমানে বহু ক্রিকেটার টিভিতে জুয়াখেলার বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। তাদের লক্ষ্য ক্রিকেটের নামে কত অর্থ পকেটে ভরা যায়।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মঞ্চকেও ব্যবহার করতে চেয়েছেন মোদি, অমিত শাহরা

এবারের বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলা হয়েছে আমেদাবাদের যে স্টেডিয়ামে সেই মোতেরা স্টেডিয়াম দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের একটি বড় মঞ্চ। ২০২১ সালে এই স্টেডিয়ামের নাম নিজের নামে রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেবল ভারত নয়, বিশ্বের কোথাও এমন নির্লজ্জতার উদাহরণ বিরল। মধ্যযুগের রাজা-মহারাজাদের মতো নিজের নামাঙ্কিত সেই স্টেডিয়ামে ফাইনালের দিন সপারিষদ উপস্থিত ছিলেন মোদি, অমিত শাহরা। দেশের ধনীতম ক্রীড়াসংস্থা বিসিসিআই-এর সচিব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পুত্র জয় শাহ, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর ইত্যাদিরাও ছিলেন। স্টেডিয়ামে মুহুর্মুহু উঠছিল 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান। ঠিক যেমন ইসরোর সফল চন্দ্রাভিযানের পর গোটা দেশকে জোর করে নরেন্দ্র মোদির মুখ দেখানো, ভাষণ শোনানো হয়েছিল, তেমনই ফাইনালে ভারতের সম্ভব্য বিজয়ের পরেই আরও একবার কৃতিত্ব নেওয়ার মঞ্চ প্রস্তুত করাই ছিল বলে অনেকের অনুমান। কিন্তু ফাইনালের ফল সেই পরিকল্পনায় জল ঢেলে দেওয়ায় পুরস্কার-বিতরণ মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টিকটুভাবে প্রস্থান করেছেন।

কুসংস্কার, ধর্মীয় আচার নয়, নিবিড় অনুশীলনই সাফল্য আনতে পারে

এমনিতেই ক্রিকেট, ফুটবল সহ নানা খেলায় কুসংস্কারের ব্যাপক প্রভাব আছে। তার উপরে গত এক দশক ধরে বিজেপি শাসনে এইগুলি ব্যাপক ভাবে বেড়েছে। সুতরাং, ভারত সেমিফাইনালে ওঠার পর থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল মন্দিরে, দরগায় প্রার্থনা, মানত করা। অনেক জ্যোতিষী ভারত 'চ্যাম্পিয়ন' হবে বলে ঘোষণা করে দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্ধকুসংস্কার নয়, ভবিষ্যদ্বাণীও নয়— খেলার মাঠে জয়পরাজয় নির্ধারিত হয় সেই দিনের পারফর্ম্যান্স দিয়েই। তাই ভারত যেমন ভাল খেলে নিউজিল্যান্ডকে সেমিফাইনালে হারিয়েছে, তেমনই অস্ট্রেলিয়া ভালো খেলেই ফাইনালে ট্রফি জিতেছে। এখানে অলৌকিকতার কিংবা পয়া-অপয়ার কোনও ঠাঁই নেই। নিবিড় অনুশীলন, সঠিক প্রশিক্ষণ, সঠিক পরিকল্পনাই সাফল্য নিয়ে আসে। আবারও তা প্রমাণ হল বিশ্বকাপ ফাইনালে।

দায়িত্ব ছিল বামপন্থীদেরই

একের পাতার পর

তারা ঘটিয়েছে? মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, শিক্ষা-চিকিৎসার সর্বজনীন সুযোগ— এগুলি আগের থেকে বেড়েছে না কমেছে? মানুষে মানুষে আর্থিক বৈষম্য কি আগের থেকে কমেছে? জাত-ধর্ম-বর্ণের বিভেদ কমানোর কোনও চেষ্টা কি এই সব দল-পরিচালিত সরকারগুলি করেছে? সকলেই জানেন, এই সমস্ত সমস্যাই কমা দূরের কথা, এত বিপুল পরিমাণে বেড়েছে যে, তা মানুষের জীবনকে ক্রমাগত দুর্বিষহ করে তুলছে। তা হলে কোন উন্নয়নের কথা, কোন সাফল্যের কথা তাঁরা বললেন?

বিজেপি রামমন্দির তৈরিকে তাদের বিরাট 'সাফল্য' হিসাবে জনতার সামনে তুলে ধরেছে। আর কংগ্রেস সেই 'সাফল্যে' ভাগ বসাতে দাবি করেছে, 'আমরাই তো প্রথম বাবরি মসজিদের তালা খুলে দিয়েছি'। জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি এড়িয়ে বিজেপি নেতারা হিন্দুত্বের জিগির তুলে হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করতে ক্যামেরাম্যান সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরেছেন, পুজো দিয়েছেন। কংগ্রেস নেতারাও ঠিক একই রকম ভাবে মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে মাথা ঠেকিয়েছেন। একই রকম ভাবে, ভোট টানতে কংগ্রেস যখনই কিছু খয়রাতি ঘোষণা করেছে, বিজেপি সঙ্গে সঙ্গে সেই খয়রাতির অঙ্ক আরও খানিকটা বাড়িয়ে তারা যে আরও বড় জনদরদি তা জানান দিয়েছে। দুই দলের ক্রমাগত পাল্লা দেওয়া খয়রাতির ঘোষণা শুনে মনে হয়েছে যেন দেশজুড়ে খয়রাতির নিলাম চলছে। তা হলে কোথায় ফারাক দুই শিবিরের রাজনীতিতে? কোথায় জনজীবনের সত্যিকারের উন্নয়নের কথা? বাস্তবে জীবনের মূল সমস্যাগুলিকে স্পর্শ না করে কিছু খয়রাতি দেওয়াকেই এই দলগুলি জনগণের জীবনের উন্নয়ন এবং তাদের শাসনের সাফল্য বলে প্রচার করেছে। অসচেতন, নিরুপায়, আজন্ম বঞ্চিত মানুষ, যাদের জীবনে প্রচলিত রাজনীতি প্রতারণারই আর এক রূপ হিসাবে চিরকাল দেখা দিয়েছে, তারা কোনও যথার্থ বিকল্প না পেয়ে এই দলগুলিরই কোনও না কোনওটিকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছে। ভেবে দেখারও তাঁদের সুযোগ হয়নি যে, প্রতারক এই দলগুলি যে পরিমাণ খয়রাতির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তার কত গুণ তাদের জীবন থেকে প্রতিদিন কেড়ে নিচ্ছে। শুধু গ্যাসের দামই সিলিন্ডার পিছু পাঁচশো টাকা বাড়ানো হয়েছে। চিকিৎসা এবং শিক্ষার খরচ বেড়েছে বহুগুণ। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে এমন হারে যে, এইসব ছিটেফোঁটা খয়রাতির সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। আট ঘণ্টা শ্রম-সময়কে বাড়িয়ে বারো ঘণ্টা করে দেওয়া হয়েছে। মালিকদের মুনাফা আকাশচুম্বী করতে ন্যূনতম বেতনের কোনও বালাই কোনও দলের কোনও সরকার রাখেনি। স্বাভাবিক ভাবেই একের পর এক নির্বাচন আসে-যায় শোষণ, বঞ্চনা আর প্রতারণা সাধারণ মানুষের জীবনে অনড় হয়েই থেকে যায়। যে শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্বের কারণে শাসক দলগুলি জনজীবনে এমন দুর্ভোগ চাপিয়ে দিতে পারছে, সেই ব্যবস্থারই সমর্থক, রক্ষক, প্রতিপালক হয়ে কী করে এই দলগুলি সেই দুর্ভোগ থেকে জনগণকে রক্ষা করবে। তা হলে জনসাধারণের জীবনে, শ্রমজীবী মানুষের জীবনে এই কি ভবিতব্য? এর কি কোনও পরিবর্তন নেই? এই কি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে?

পরিবর্তন অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই পরিবর্তন এই ব্যবস্থারই রক্ষক বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া দলগুলির একটির বদলে আর একটিকে ভোট দিয়ে সরকারে বসিয়ে আসবে না। তার জন্য দরকার এই পুঁজিবাদী রাজনীতির বিকল্প শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষার বামপন্থী রাজনীতি। সে রাজনীতি ক্ষমতা দখলের হীন রাজনীতি নয়। সংগ্রামী বামপন্থার গণআন্দোলনের রাজনীতি। গণসংগ্রামের বিপ্লবী রাজনীতি।

কিন্তু কোথায় সেই সংগ্রামী বামপন্থার বিকল্প রাজনীতি? যারা নিজেদের বৃহৎ বামপন্থী দল বলে দাবি করেন, এতগুলি রাজ্যের নির্বাচনে কোথাও তারা সেই বিকল্প বামপন্থী রাজনীতির নজির রাখতে পেরেছেন কি? পারেননি। সিপিএম সিপিআইয়ের মতো দলগুলি বুর্জোয়াদেরই বিকল্প আর একটি জোট 'ইন্ডিয়া'তে গিয়ে সামিল হয়েছেন। এই ইন্ডিয়া জোট কি নীতিগত ভাবে বিজেপির বিকল্প জোট? বামপন্থীরা কি বিকল্প কোনও নীতি এই জোটের মধ্যে তুলে ধরতে পেরেছেন? বিজেপির আর্থিক নীতির বিকল্প কোনও নীতি কি ইন্ডিয়া জোটের রয়েছে? ইন্ডিয়া জোট আগামী লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হলে কি বিজেপির বেসরকারিকরণের নীতি পরিত্যাগ করবে? বিজেপি যে ভাবে শ্রম আইন বদলের দ্বারা শ্রমজীবী মানুষের সমস্ত অর্জিত অধিকারগুলিকেই কেড়ে নিয়েছে, সেগুলি ফিরিয়ে দেবে? না, এমন কোনও ঘোষণাই এই জোটের পক্ষ থেকে করা হয়নি। বিজেপির যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যকে ধ্বংস করছে, ইন্ডিয়া জোটের নীতি তার কোনও বিকল্প দেখাতে পেরেছে? বাস্তবে ইন্ডিয়া জোটের বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়া দলগুলির একটিও নীতিগত ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার এমনকি বুর্জোয়া ধারণাকেও পোষণ করে না। বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমই প্রতিদিন লিখছে, বিজেপি যদি কড়া হিন্দুত্বের লাইন নিয়ে চলে তো কংগ্রেস নরম হিন্দুত্বের লাইন নিয়ে চলছে। অর্থাৎ উভয় দলই সাম্প্রদায়িকতার লাইন নিয়ে চলেছে।

কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী, আরজেডি, ডিএমকে, আপ প্রভৃতি বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়া দলগুলি যে নীতি নিয়ে চলছে, যা নানা কথার চাতুরিতে এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখারই রাজনীতি, তথাকথিত এই বৃহৎ বামপন্থী দলগুলি সেই নীতি মেনেই এই জোটে সামিল হয়েছেন। এবং জোট-ধর্ম অনুযায়ী কোথাও কংগ্রেসকে, কোথাও আরজেডিকে, কোথাও এদেরই অন্য কাউকে ভোট দেওয়ার জন্য জনগণের কাছে আবেদন করে চলেছেন।

তা হলে তাদের ইন্ডিয়া জোটে সামিল হওয়ার দ্বারা দেশের শোষিত বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের কোন উপকারটা হল? সিপিএমের অনেক আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও রাজস্থানে, মধ্যপ্রদেশে কিংবা তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস তাদের কোনও আসন ছাড়তে রাজি হয়নি। সিপিএম রাজস্থানে তাদের গতবারের জেতা দুটি আসনই এ বার হারিয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস যদি তাদের আসন ছাড়ত এবং সিপিএম নিজেদের আসন দুটি রক্ষা করতে পারত কিংবা তাদের আসন আরও কয়েকটা বাড়ত, তার দ্বারাও কি বামপন্থা শক্তিশালী হত? শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই জোরদার হত? তাদের জেতা-হারার সঙ্গে বামপন্থা শক্তিশালী হওয়ার আদৌ কি কোনও সম্পর্ক আছে? পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা ৩৪ বছর ধরে নিরঙ্কুশ রাজত্ব করেছেন। তার দ্বারা বামপন্থা শক্তিশালী হয়েছে? সিপিএম নেতারাও জানেন, শক্তিশালী হওয়া দূরের কথা, বরং বামপন্থা কলঙ্কিত হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় তাঁরা সমর্থন হারিয়েছেন এবং দুর্নীতি-স্বজনপোষণ-মালিক তোষণ দেখে বামপন্থা সম্পর্কে সাময়িক ভাবে হলেও কিছু মানুষের মনে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। কেরালাতেও তাঁরা সরকারে। সেখানে বামপন্থার ভিত্তিতে কোনও বিকল্প কি তাঁরা তুলে ধরেছেন। নাকি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজেপি-কংগ্রেসের রাস্তাতে পুঁজিপতিদের স্বার্থই রক্ষা করে চলেছেন!

এটা ঘটল এই কারণে যে, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষার রাজনীতি, তাদের মুক্তিসংগ্রাম শক্তিশালী করার রাজনীতি তাঁরা করেননি। বামপন্থার নামে নানা কথার চাতুরিতে তাঁরা পুঁজিবাদেরই সেবা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরা বামপন্থার নাম নিয়ে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' স্লোগান তুলে, লাল পতাকা উড়িয়ে ক্ষমতায় বসেছিলেন। তাই বড় অংশের এক দল মানুষ বিচার না করেই তাঁদের শ্রমিক শ্রেণির দল বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাঁদের স্বরূপ চিনতে এই অংশের মানুষের কিছুদিন সময় লেগেছে। মনে পড়ে যায় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সেই বিখ্যাত উক্তি— মিথ্যাকে মানুষ চিনতে পারে, কিন্তু সত্য যদি মিথ্যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, মিশে থাকে, তবে না যায় সত্যকে আলাদা করে চেনা, না করা যায় মিথ্যাকে আলাদা। এ ক্ষেত্রেও তাই, তাঁদের সোসাল ডেমোক্রেটিক আপসকামী চরিত্রের সঙ্গে বামপন্থী বুলি মিশেছিল বলে অসচেতন মানুষের চিনতে দেরি হয়েছে, কিন্তু তাঁদের মেকিত্ব শেষ পর্যন্ত ঠিক ধরা পড়েছে।

এর ফল কী হয়েছে? বামপন্থা দুর্বল হয়েছে। সংগ্রামী বামপন্থার বিকল্প রাস্তায় চললে হয়ত সিট জেতার গ্যারান্টি পাওয়া যেত না, কিন্তু শোষিত মানুষের সামনে মুক্তির সঠিক রাস্তাটা তুলে ধরা যেত। এটা দেখানো যেত যে, সঠিক নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ না হয়ে, লড়াই না গড়ে তুলে শোষিত মানুষ কখনও তার দাবি আদায় করতে পারে না। কিন্তু ক্ষমতা ভোগ করার লোভে, এমএলএ-এমপি-মন্ত্রী হওয়ার মোহে তারা আপাতকঠিন এই রাস্তাকে সব সময়ই এড়িয়ে চলেছে। এই লোভেই পুঁজিপতি শ্রেণির অন্যতম বিশ্বস্ত দল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করতেও তাদের বাধেনি। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) উদ্যোগ নিয়ে ছটি বামপন্থী দলের যে সংগ্রামী জোট গড়ে তুলেছিল তাঁরা কোনও কিছু না জানিয়েই এস ইউ সি আই (সি)কে সেই জোট থেকে বাদ দিয়ে দেয়। কেন না তাতে কংগ্রেস ও অন্য জাতপাত ভিত্তিক দলগুলোর সঙ্গে ভোটের দরকষাকষির বদলে সংগ্রামী বামপন্থার রাস্তায় চলতে হত।

তাই এস ইউ সি আই (সি) একাই সংগ্রামী বামপন্থার লাইন নিয়ে এগিয়ে চলেছে। মধ্যপ্রদেশে, রাজস্থানে কিংবা অন্য রাজ্যগুলিতে যত আসনে লড়েছে তার প্রচারে শোষিত মানুষের সামনে এই সংগ্রামী বিকল্পই তুলে ধরেছে। নীতি যদি সঠিক হয়, নেতৃত্ব যদি সঠিক হয়, যদি তা মানুষের মুক্তির সঠিক রাস্তা দেখাতে পারে তবে সমর্থন আজ কম থাকলেও ক্রমাগত সেই সমর্থন বাড়বে এবং একদিন শক্তিশালী সংগঠন গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে জোরদার গণআন্দোলন গড়ে উঠবে। আর নীতি যদি ভুল হয়, যে কোনও প্রকারে সমর্থন পাওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে একদিন অনেক সমর্থন পেলেও সে সমর্থন থাকবে না। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা, এ যুগের অন্যতম মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষ যেদিন সিপিআইয়ের মতো একটি শক্তিশালী দল দেশে থাকা সত্ত্বেও সেই দলটি সঠিক মার্ক্সবাদী দল নয়, এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দেশের একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে গড়ে তুলেছিলেন সেদিন তাঁর পাশে হাতে গোনা কয়েক জন সহযোদ্ধা ছিলেন। আজ সেই পার্টি দেশের ২৫-২৬টি রাজ্যে সংগ্রামী বামপন্থী দল বলে পরিচিতি লাভ করেছে। দেশ জুড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক, কৃষক, দরিদ্র-নিম্নবিত্ত মানুষ পুঁজিবাদী শোষণ-নিপীড়নে পিষ্ট হচ্ছে, মুক্তি-যন্ত্রণায় ছটফট করছে, পুঁজিবাদী নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে মাঝে মাঝেই স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভে ফেটে পড়ছে এবং রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের শিকার হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সঠিক বিপ্লবী লাইন ছাড়া কে তাদের আস্থা, সাহস এবং বল জোগাতে পারে! এস ইউ সি আই (সি) সর্বশক্তি দিয়ে সেই কাজটাই করছে।

আজ সিপিএম-সিপিআইয়ের বামপন্থী কর্মীদের ভেবে দেখতে হবে, তারা তাঁদের নেতাদের দেখানো ভোট-রাজনীতির রাস্তায় হাঁটবেন, নাকি শোষিত মানুষের যথার্থ মুক্তির প্রয়োজনে বিকল্প বামপন্থী রাস্তায়, যা শ্রমজীবী মানুষের সংগঠিত গণআন্দোলনের রাস্তা, লড়াইয়ের রাস্তা, আপসহীনতার রাস্তা, সেই রাস্তায় হাঁটবেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল আরএসএস

তিনের পাতার পর

মহাসভা তুলুক না কেন, তারা দীর্ঘদিন ব্রিটিশ রাজত্বের শেষভাগে বাংলায় এবং একসময় সিন্ধুপ্রদেশেও মুসলিম লিগের সাথে যৌথ সরকার চালিয়েছে।

এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন বলিষ্ঠ যোদ্ধা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এই ভূমিকা দেখেই বলেছিলেন, "সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের ত্রিশূল হাতে হিন্দু মহাসভা ভোটভিক্ষায় পাঠিয়েছে। ত্রিশূল আর গেরুয়া বসন দেখলে হিন্দুমাত্রেই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়ে ধর্মকে কলুষিত করে হিন্দু মহাসভা রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। হিন্দু মাত্রেরই এর নিন্দা করা কর্তব্য। ... এই বিশ্বাসঘাতকদের আপনারা রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে সরিয়ে দিন। তাদের কথা কেউ শুনবেন না।" (*১৯৪০ ঝাড়গ্রামের ভাষণ*) নিজেদের এই ইতিহাস নিয়েই আজ আরএসএস-বিজেপি দেশপ্রেমের পাঠ দিচ্ছে জনগণকে!

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (৮)

ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থান পূরণ হবে কী দিয়ে

এ বছরটি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ। এই উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে ভি আই লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুবাদ সংক্রান্ত যে কোনও মতামত সাদরে গৃহীত হবে। এ বার অষ্টম কিস্তি।

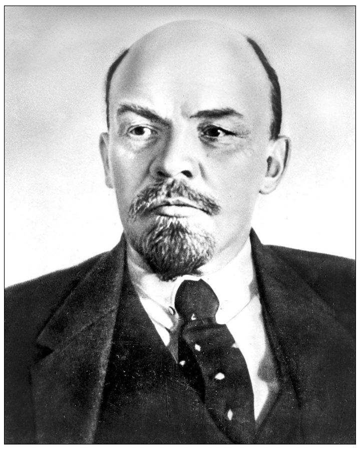

ভি আই লেনিন

১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে, এই প্রশ্নে, মার্ক্সের উত্তর ছিল একেবারে বিমূর্ত ধরনের। বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, এই উত্তর কর্তব্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে, কিন্তু কী ভাবে তা সম্পন্ন করা যাবে সেই বিষয়ে কোনও কথা বলেনি। কমিউনিস্টম্যানিফেস্টোতে যে উত্তর দেওয়া হয়েছে তা হল, এই রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থান পূরণ হবে গণতন্ত্রের সংগ্রামে জয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে শাসক শ্রেণি হিসাবে সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণির দ্বারা।

কল্পনাবিলাসকে প্রশ্রয় না দিয়ে মার্ক্স আশা করতেন শাসক শ্রেণি হিসাবে সর্বহারার সংগঠন কী রূপ ধারণ করবে এবং 'গণতন্ত্রের যুদ্ধ জয়ের' সাথে এই সংগঠনের সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগ কী ভাবে সাধিত হবে, সেই প্রশ্নের উত্তর গণআন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকেই পাওয়া যাবে।

প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা যত অল্পই হোক, মার্ক্স সেই অভিজ্ঞতাকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাঁর 'দ্য সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স' ('ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ') গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছিলেন। এই গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দেওয়া যাক।

"মধ্যযুগে সৃষ্টি হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি বিকশিত হয়, গঠিত হয় 'স্থায়ী সেনাবাহিনী, পুলিশ, আমলাতন্ত্র, যাজকতন্ত্র, ও বিচারবিভাগ সহ এর সর্বব্যাপক যন্ত্রগুলি। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে শ্রেণিবিরোধ যতই বাড়তে থাকে ততই রাষ্ট্রশক্তি শ্রেণি শাসনের হাতিয়ার হিসাবে শ্রমিক শ্রেণিকে দমনের জন্য পুঁজির একটা জাতীয় শক্তির আকার ধারণ করতে থাকে। রাষ্ট্র হয়ে পড়তে থাকে সমাজকে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করার একটা সেনাবাহিনী, শাসক শ্রেণির স্বৈরাচারী শাসনের চালিকা শক্তি। প্রতিটি বিপ্লবই শ্রেণি সংগ্রামের অগ্রগতির পর্যায় সূচিত করে। কিন্তু এই বিপ্লব সৃষ্ট রাষ্ট্র নিজের দমনমূলক চরিত্রকে ক্রমাগত স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে দিতে থাকে। ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবের পর রাষ্ট্রশক্তি শ্রমের বিরুদ্ধে পুঁজির লড়াইয়ের একটা জাতীয় যুদ্ধবাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য একে আরও সংহত করেছিল।"

সাম্রাজ্যের সরাসরি বিপরীত হল কমিউন। কমিউন ছিল এমন এক প্রজাতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট রূপ যা শ্রেণি-শাসনের রাজতান্ত্রিক রূপকেই শুধু খতম করে দিতে পারত না, খতম করে দিতে পারত সব ধরনের শ্রেণি শাসনকেই।"

সর্বহারা, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের 'সুনির্দিষ্ট' রূপ কী? কী ধরনের রাষ্ট্র সে সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল?

"...কমিউনের প্রথম ডিক্রি ছিল স্থায়ী সেনাবাহিনীকে দমন করা এবং সশস্ত্র জনগণের শক্তি দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপিত করা।"

নিজেদের সমাজতন্ত্রী হিসাবে দাবি করে, এমন প্রতিটি পার্টির কর্মসূচিতেই আজকাল এই দাবিটি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সোসালিস্ট রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিকদের কর্মসূচির যথার্থ চরিত্র আমরা তখনই বুঝতে পারব, যখন দেখব, ২৭ ফেব্রুয়ারির বিপ্লবের ঠিক পরে পরেই তারা প্রকৃতপক্ষে এই দাবিটি বাস্তবায়িত করতে অস্বীকার করল।

"মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলরদের নিয়ে কমিউন গঠিত হয়েছিল। এই কাউন্সিলররা নির্বাচিত হয়েছিলেন প্যারিস শহরের নানা ওয়ার্ডের মানুষের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। তাঁরা ছিলেন নির্বাচকদের কাছে দায়বদ্ধ এবং যে কোনও সময় এঁদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া যেত। স্বাভাবিকভাবেই, এই সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন শ্রমিক অথবা শ্রমিক শ্রেণির নির্বাচিত প্রতিনিধি। ... সরকারের যন্ত্র হিসাবে কাজ করার পরিবর্তে তৎক্ষণাৎ পুলিশের রাজনৈতিক পরিচয় বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে পুলিশকে কমিউনের প্রতি দায়বদ্ধ ও যে কোনও সময় পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় এমন কর্মচারীতে পরিণত করা হয়েছিল। প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার করা হয়েছিল। কমিউনের সদস্য থেকে শুরু করে নিচুতলা পর্যন্ত সরকারি কাজে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীকে 'শ্রমিকের মজুরি' নিয়ে কাজ করতে হত। রাষ্ট্রের বিশিষ্ট উচ্চ পদাধিকারীদের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বিশেষ অধিকার ও বিশেষ সাম্মানিক বিলুপ্ত করা হয়েছিল।

...পুরনো সরকারের দমনের যন্ত্র স্থায়ী সেনাবাহিনী ও পুলিশের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার ফলে কমিউন আধ্যাত্মিক দমনশক্তি, যাজকতন্ত্রকে ভাঙার কাজে আত্মনিয়োগ করে। বিচার বিভাগের কর্তারা তাদের মেকি স্বাধীনতা হারায়। ...তাদের নির্বাচিত হয়ে আসা, কমিউনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা এবং যে কোনও সময় তাদের ফিরিয়ে আনা যাবে— এমন ব্যবস্থা হয়।

এইভাবে স্থায়ী সেনাবাহিনীর অবলুপ্তি ঘটিয়ে, সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের নির্বাচিত হওয়া এবং তাদের অপসারিত করার ব্যবস্থা চালু করে কমিউন ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্রটির পরিবর্তে 'কেবলমাত্র' পূর্ণতর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। যদিও বাস্তবে, এই 'কেবলমাত্র' কথাটির তাৎপর্য কোনও প্রতিষ্ঠানকে মৌলিকভাবে আলাদা প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিরাট আকারে বদলে ফেলা। 'পরিমাণগত পরিবর্তনকে গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত করা'-র এ হল একটা আদর্শ উদাহরণ। যতটা উপলব্ধি করা যায়, এই হল গণতন্ত্রের পূর্ণতর সুসমঞ্জস রূপ। এখানে বুর্জোয়া গণতন্ত্র সর্বহারা গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়, রাষ্ট্র (একটা নির্দিষ্ট শ্রেণিকে দমনের বিশেষ শক্তি) রূপান্তরিত হয় এমন একটা কিছুতে যা প্রচলিত অর্থে আর রাষ্ট্র নয়।

বুর্জোয়াদের দমন করা এবং তাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করা এখনও প্রয়োজন। কমিউনের জন্য বিশেষ করে এর প্রয়োজন ছিল। এবং কমিউনের পরাজয়ের অন্যতম কারণ, বুর্জোয়াদের দমনের কাজটা তারা যথেষ্ট দৃঢ়তার সাথে করেনি। এর আগে দাস ব্যবস্থায়, সামন্ততন্ত্রে ও মজুরি-দাসত্বের সময়ে সংখ্যালঘুরাই দমনের যন্ত্র হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু, এখন সংখ্যালঘুরা নয়, দমনের যন্ত্র হিসাবে কাজ করছে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। যেহেতু জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিজেরাই তাদের নিপীড়কদের দমন করছে, তাই দমনের 'বিশেষ বাহিনীর' আর কোনও প্রয়োজন থাকছে না। এই অর্থে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হতে শুরু করে। সুবিধাভোগী সংখ্যালঘুর (সুবিধাভোগী আমলাতন্ত্র, স্থায়ী সেনাবাহিনীর প্রধানরা) বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছাড়াই, সংখ্যাগুরুরা নিজেরাই সরাসরি এই সব কাজ করতে পারে। যতই রাষ্ট্রযন্ত্রের সব কাজ সামগ্রিকভাবে জনগণ নিজেই করতে থাকে ততই এই বিশেষ শক্তির অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা কমে যেতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে কমিউনের যে সব কাজকে মার্ক্স গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই সব কাজ হল, সমস্ত প্রতিনিধি ভাতার অবলুপ্তি, সরকারি কর্তাদের আর্থিক সুবিধার বিলোপ, রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মচারীদের বেতন কমিয়ে 'শ্রমিকদের মজুরি'র সমান করে দেওয়া। এখানে পরিষ্কার দেখা যায়, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের থেকে সর্বহারা গণতন্ত্রের দিকে, নিপীড়কদের গণতন্ত্র থেকে নিপীড়িত শ্রেণির গণতন্ত্রের অভিমুখে যাত্রা শুরু হয়েছে। একটা বিশেষ শ্রেণির নিপীড়নের যন্ত্র থেকে রাষ্ট্র সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের, শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র হিসাবে নিপীড়ক শ্রেণিকে দমনের সাধারণ বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে, বোধ করি রাষ্ট্র সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে, মার্ক্সের শিক্ষাকে পুরোপুরি ভুলে যাওয়া হয়েছে! মার্ক্সবাদের অসংখ্য সুলভ ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু কোনওটিতেই মার্ক্সের এইসব কথার উল্লেখ নেই। এ যেন অতি সরল পুরনো কিছু কথা। তাই এ সম্পর্কে নীরব থাকাই শ্রেয়। ঠিক যেমন রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর, খ্রিস্টানরা তাদের গণতান্ত্রিক বিপ্লবী শক্তিসম্পন্ন পুরনো সরল খ্রিস্ট ধর্মকে ভুলে গিয়েছিল— এও যেন ঠিক তেমন বিষয়।

মনে হতে পারে, উচ্চ পদাধিকারী রাষ্ট্রীয় আমলাদের বেতন কমিয়ে দেওয়া আদিম সরল গণতন্ত্রের দাবি। আধুনিক সুবিধাবাদের অন্যতম 'প্রতিষ্ঠাতা', প্রাক্তন সোসাল ডেমোক্র্যাট, এডোয়ার্ড বার্নস্টাইন বারবার 'আদিম' গণতন্ত্রকে স্থূল বুর্জোয়া ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন। সমস্ত সুবিধাবাদীদের মতো এবং বর্তমানের কাউটস্কিপন্থীদের মতো, তিনি একেবারেই বুঝতে পারেননি যে, প্রথমত, কিছুটা পরিমাণে 'আদিম' গণতন্ত্রে ফিরে না গেলে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ অসম্ভব (কারণ, না হলে কেমন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ও তারপর ব্যতিক্রমহীনভাবে সমগ্র জনগণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করবে?)। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী সংস্কৃতির উপর দাঁড়ানো 'আদিম গণতন্ত্র' ও প্রাক-পুঁজিবাদী সময়ে বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম গণতন্ত্র এক বস্তু নয়। পুঁজিবাদী সংস্কৃতি বৃহদায়তন শিল্প, কলকারখানা, রেলওয়ে, ডাক বিভাগ, টেলিফোন ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে এবং এর উপর ভিত্তি করে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রায় অধিকাংশ কাজকর্ম অত্যন্ত সহজ সরল হয়ে গেছে। এত সহজ সরল হয়ে গেছে যে, তা রেজিস্ট্রি করা, রেকর্ড করা ও যাচাই করার মতো সহজ কাজে পরিণত হয়েছে। এই কাজ শিক্ষিত যে কোনও মানুষ অত্যন্ত সহজে করতে পারে। সাধারণ শ্রমিকের মজুরিতেই এই কাজ করা সম্ভব। আর এই কাজের সাথে জড়িয়ে থাকা সুবিধাভোগের অধিকার ও পদমর্যাদা একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা যায় (এবং তা করতেই হবে)।

ব্যতিক্রমহীন ভাবে সমস্ত সরকারি কর্মচারীকে নির্বাচিত হতে হবে, তাদের যে কোনও সময় ফিরিয়ে নেওয়া যাবে, তাদের বেতন কমিয়ে সাধারণ 'মজুরির' সমান করা হবে— এই সব সরল স্বতঃস্পষ্ট গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ শ্রমিক ও অধিকাংশ কৃষকের স্বার্থকে সম্পূর্ণ ভাবে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে এবং একই সাথে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়ার সেতু রচনা করে। এই সব পদক্ষেপ রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের প্রশ্নের সাথে এবং সমাজের যথার্থ রাজনৈতিক পুনর্গঠনের প্রশ্নের সাথে যুক্ত। কিন্তু অন্যের সম্পদ যারা জোর করে ভোগ দখল করছে, তাদের যখন অধিকারচ্যুত করা যাবে বা সেই কাজ চলতে থাকবে অর্থাৎ যখন উৎপাদনের উপকরণের উপর পুঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানার রূপান্তর ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক মালিকানায় পরিণত করা যাবে, তখনই এর সম্পূর্ণ অর্থ ও তাৎপর্য স্পষ্ট হবে।

মার্ক্স লিখেছেন, 'বুর্জোয়া বিপ্লবের সেই মনোহর প্রতিশ্রুতি, কম খরচে সরকার পরিচালনাকে কমিউন বাস্তবে রূপ দিয়েছে। সরকারি ব্যয়ের সবচেয়ে বড় দুটো উৎস— স্থায়ী সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রকে কমিউন ধ্বংস করে দিয়েছে।'

কৃষক ও অন্যান্য অংশের পেটিবুর্জোয়াদের মধ্য থেকে একটা নগণ্য অংশ 'উপরে উঠতে পারে', বুর্জোয়া অর্থে 'সংসারে উন্নতি লাভ' করতে পারে, অর্থাৎ তারা ধনী হয়ে বা বুর্জোয়া হয়ে, কিংবা সুবিধাভোগী আমলায় পরিণত হয়ে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে। যে সব পুঁজিবাদী দেশে কৃষক আছে (প্রায় সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই আছে), সেই সব দেশে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের সরকার নির্যাতন করে। কৃষকরা সেই সরকারকে উৎখাত করতে চায়, তারা চায় 'কম খরচে পরিচালিত' সরকার। সর্বহারা শ্রেণিই একমাত্র এই ধরনের সরকার দিতে পারে। সাথে সাথে এই ধরনের সরকার গঠন করে সর্বহারা শ্রেণি রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের দিকে এক ধাপ এগিয়ে যায়।

(চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার পাঞ্জাবের শিক্ষাবিদরা

৩ ডিসেম্বর লুধিয়ানার পাঞ্জাবী ভবন হলে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধে সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির পাঞ্জাব শাখার দ্বিতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে অমৃতসর সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডঃ শ্যামসুন্দর দীপ্তি বলেন, বর্তমান শাসকরা ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞানবিরোধী কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা সৃষ্টির অপচেষ্টায় মত্ত হয়েছে। জে এন ইউ-এর প্রাক্তন অধ্যাপক চমন লাল বলেন, শহিদ ভগৎ সিং-এর মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে মূল্যবোধের চর্চা স্বাধীন ভারতে চেয়েছিলেন তার প্রসারে এই শিক্ষানীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুলদীপ পুরি বলেন, এই শিক্ষানীতি নতুন করে ইতিহাস রচনার নামে পরিকল্পিতভাবে দেশের ইতিহাস বিকৃত করছে। সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডঃ তরুণকান্তি নস্কর বলেন, এই শিক্ষানীতি বিশ্বব্যাঙ্কের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি ও হিন্দুত্ববাদী ভাবনা-ধারণার এক অদ্ভুত ‘ককটেল’ যা ভারতের বহুত্ববাদী ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করছে ও সরকার পোষিত শিক্ষাকে ধ্বংস করছে। বিশ্বব্যাঙ্ক কোনও আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রণয়নের সংস্থা নয়, বরং বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তাকে ভারতের শিক্ষানীতি নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া থেকে পরিষ্কার, সরকার শিক্ষাকে কী দৃষ্টিতে দেখে।

এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক যগবন্ত সিং, অধ্যাপক সুকদেব সিং শির্সা, বিক্রম দেব সিং, সাহিব সিং (নাট্যকার) প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সম্পাদক অধ্যাপক আমিন্দার পাল সিং।

দ্রুত নিয়োগের দাবি ঃ মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি এ আই ইউ টি ইউ সি-র

এসএলএসটি-র নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ স্তরের প্রথম মেধা তালিকাভুক্ত চাকরি প্রার্থীদের অবস্থান আন্দোলন ৯ ডিসেম্বর ১০০০ দিনে পড়ল। শিক্ষা দপ্তর স্বীকার করেছে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির কারণে এই মেধা তালিকাভুক্ত চাকরি প্রার্থীরা চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাই শিক্ষাদপ্তর দু-দফায় নিয়োগ ও সুপারনিউমেরারি পদ তৈরির কথা ঘোষণা করেছে।

কিন্তু নোটিফিকেশন ও ঘোষণার ১ বছর পরেও এখনও চাকরি প্রার্থীদের কাজ দেওয়া হয়নি আইনি জটিলতার কথা বলে। তদন্ত ও আইনি পদক্ষেপের নামে কালক্ষেপ করা হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের শূন্যপদ ২ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশি। পঠন-পাঠন মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এআইইউটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ৮ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি করেছে— মেধা তালিকাভুক্ত সকল প্রার্থীদের অবিলম্বে চাকরির নিয়োগপত্র দিতে হবে, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সমস্ত শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে, সমস্ত অবৈধ নিয়োগ বাতিল করতে হবে, শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতিকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

চাকরি প্রার্থীদের প্রতি সংহতি জানিয়ে আন্দোলনকারীদের হাতে পুষ্পস্তবক দিচ্ছেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস

বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে ৯ ডিসেম্বর অবস্থানস্থলে গিয়ে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস পুষ্পস্তবক তুলে দেন আন্দোলনকারীদের হাতে। আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি।

আনএমপ্লয়েড ইউথ স্ট্রাগল কমিটি ঃ চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনের ১০০০তম দিনে বেশ কয়েক জন চাকরিপ্রার্থী প্রতিবাদস্বরূপ মাথা মুড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অবিলম্বে চাকরিতে নিয়োগের দাবি জানান। আনএমপ্লয়েড ইউথ স্ট্রাগল কমিটির রাজ্য সম্পাদক সঞ্জয় বিশ্বাসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল পুষ্পস্তবক দিয়ে আন্দোলনকারীদের সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানান। রাজ্য সম্পাদক সেখানে অনুষ্ঠিত গণ কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অবিলম্বে নিয়োগের দাবি জানান।

বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল

প্রতিবাদ এআইডিএসও-র

রাজ্যের ২০০টির বেশি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল এবং বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটির (বিএড ইউনিভার্সিটি) নিয়মিত কাজকর্ম বন্ধের বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, হঠাৎ করে বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি (বি এড ইউনিভার্সিটি) কর্তৃপক্ষ তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম স্থগিত রাখায় সাড়ে ৬০০ কলেজের প্রায় ৬০ হাজার ছাত্রছাত্রী চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন। বিএড-এর দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা চলছে। ৪-৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিএড-এর দ্বিতীয় সেমিস্টারের প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষা হওয়ার কথা এবং তার মার্কস জমা দেওয়ার দিন ১২ ডিসেম্বর। ইউনিভার্সিটির এই সিদ্ধান্ত বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

শিক্ষকতার চাকরির জন্য পরীক্ষায় বসতে বিএড-বিএলএড বাধ্যতামূলক। অথচ সরকারি বি এড কলেজ হাতে গোনা। যে কটি আছে তাতেও আসন সংখ্যা সামান্য। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যথেচ্ছ বেসরকারি বি এড কলেজ গড়ে ওঠে এবং তা সরকারি মান্যতাও পেয়ে যায়। এই সমস্ত বেসরকারি কলেজগুলির পরিকাঠামো, ছাত্র শিক্ষক অনুপাত, সঠিকভাবে ক্লাস না করানো, ইন্টার্নশিপ না করানো, বিশাল অঙ্কের টাকা নেওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ বহুদিনের। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির আগে পরিকাঠামো এবং ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত সহ এনসিইআরটি-র মানদণ্ড পূরণ করতে পারছে না, এই কারণ দেখিয়ে বেশ কিছু কলেজের অ্যাফিলিয়েশন বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়, যা বাস্তবে ছাত্রদের পূর্বেকার দাবিকেই মান্যতা দেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেশাদারি ভূমিকাকেই উন্মোচিত করে। এই বেসরকারি কলেজগুলির অনুমোদন বাতিলকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ এবং হুমকি আসছে এই অজুহাত দেখিয়ে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্টকালের জন্য অন্ধকারে ঠেলে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রশাসনও ঠুঁটো জগন্নাথ।

তিনি বলেন, সারা রাজ্য জুড়ে শিক্ষা জগতে ভয়ঙ্কর দুর্নীতি চলছে। এই অচলাবস্থা বেসরকারি কলেজগুলোর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও নতুন দুর্নীতির পূর্বাভাস নয় তো! তা না হলে এতগুলো কলেজ কীভাবে পরিকাঠামোবিহীনভাবে এতদিন ধরে পঠন-পাঠন এবং ছাত্র ভর্তি চালিয়ে গেল? ভর্তির আগেই সিট বুকিং এর নামে বেসরকারি কলেজগুলো ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণ টাকা নেয়, এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চুপ কেন? অনুমোদন বাতিল হওয়া কলেজগুলোর বিএড, এমএড ও ডিএলএড-এর ২০২২-২৪ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়েও সুনির্দিষ্ট কোনও বক্তব্য বিশ্ববিদ্যালয় এখনও জানায়নি।

হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছে, তার দায় কে নেবে? এর দায়ভার বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তর কোনও অবস্থাতেই অস্বীকার করতে পারে না।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দিবস পালন করল বুদ্ধিজীবী মঞ্চ

৬ ডিসেম্বর রানুচ্ছায়া মঞ্চে বুদ্ধিজীবী মঞ্চের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট জনদের অংশগ্রহণে আলোচনা, আবৃত্তি, গান, গীতিআলেখ্য ও শ্রুতিনাটকের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দিবস পালন করা হয়।

কেন্দ্রের আরএসএস-বিজেপি পরিচালিত সরকার ভোটের স্বার্থে গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনা ও বিজ্ঞান মনস্কতা অপসারিত করে যেভাবে ভারতবর্ষকে অন্ধতা, কুসংস্কার, অপবিজ্ঞান ও উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনার ভিত্তিতে বিদ্বেষ ও ঘৃণার উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত করছে তার তীব্র সমালোচনা করেন আলোচকরা। তাঁরা ইতিহাসের বিকৃতি, শিক্ষা, এমনকি চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্রেও অপবিজ্ঞান ও ঐতিহ্যের নামে হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠার ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ সুশীল সমাজকে সর্বাগ্রে সক্রিয় হয়েই প্রতিরোধ করার আহ্বান জানান।

জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কাঞ্চন দাশগুপ্ত ও আমিন সেখ, নাট্যব্যক্তিত্ব মহেশ জয়সওয়াল, মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী ও সান্টু গুপ্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সঙ্গীতশিল্পী আশিস বসু, কুমুদ মণ্ডল, আবৃত্তিকার সাইফুল ইসলাম এবং অগ্নিবীণা সংস্থা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গান, কবিতা, বৃন্দগান ও শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন।

লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে জেলায় জেলায় শহিদ মিনারে সমাবেশের প্রচার

অমিতাভ চ্যাটার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত
সম্পাদক অমিতাভ চ্যাটার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com